ইসলাম ধর্ম ও মাতৃভাষা

রফীক আহমাদ

প্রকাশক ঃ
আল-আমিন
৪০/৪১-সি, জিন্দাবাহার, ১ম লেন (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২২৭২১৫, ০১৭২৪-২৮৯০৩০
Web : www.alaminprokashon.com
E-mail : alaminprokashon@gmail.com

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ বই মেলা ২০১০ইং

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ
এম.জি. হাফিজ
Mobile : 01745-304827
E-mail : hafiz827@yahoo.com

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আঃ রশিদ
Mobile : 01718731847

পরিবেশনায় ঃ
এম.এল.এম বুক হাউজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
রাজু পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায় ঃ
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, জেলাঃ রাজশাহী।

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত টাকা) মাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৮ আগষ্ট ২০০৫ ইং তারিখে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা একাডেমী কার্যালয়ে গমন করি। প্রথমে একাডেমীর সচিব মহোদয়ের কক্ষে প্রবেশ করি, সঙ্গে ছিল আমার বড় ছেলে, বাংলাদেশ সচিবালয়ে চাকুরী করে। সচিব মহোদয়ের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়ের জের ধরেই তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাওয়া কুশলি বিনিময়ের পর আমার কিছু ধর্মীয় লিখা বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশ করার প্রস্তাব করলাম। তিনি আমার নিঃস্বার্থ প্রস্তাব অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে, বিষয়টি একাডেমীর অনুমোদন কমিটিতে উপস্থাপন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা ছাপানোর জন্যে উদ্যোগ নিবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কয়েক মাস পর ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে একাডেমীতে খোঁজ খবর নিতে গেলাম। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মেলার ব্যস্ততায় কাজ করতে পারেননি বলে সচিব মহোদয় জানালেন। ২৮ জানুয়ারী ২০০৭ পুনরায় খোঁজ নিতে গেলে তিনি জানালেন, আগামী মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই কাজটা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইত্যবসরে গত ২২ ফেব্রুয়ারী '০৭ বৃহস্পতিবার, ১০ ফাল্গুন ১৪১৩, ৩ সফর ১৪২৮ হিজরী, তারিখের 'নয়া দিগন্ত' পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের শিরোনামে দেখলাম 'ভাষার মাসে ভাষা নিয়ে বই নেই' বই মেলায় প্রাণের উৎসব, বিষয়টা পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে এক নব জাগরণ সৃষ্টি হলো। ভাবলাম, ভাষার উপর কিছু লিখা যাক। তারপর ধীরে ধীরে চিন্ত া করে নিজের আধ্যাত্মিক জগতে খুঁজে পেলাম এক উজ্জ্বল আলোর সন্ধান। দেখলাম মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা মাতৃভাষাকে ইহজগতের বুকে শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে তিনি মানব জাতির এই সত্য ও ন্যায় সঙ্গত দাবীকে পূরণ করে এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থের এই মহাসত্য স্বাক্ষর কখনও মুছে যাবার নয়।

আলোচ্য পুস্তকে মাতৃভাষার দাবীকে মানুষের দাবী নয়, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের মানুষের দাবী নয়, বরং আল্লাহর দান হিসেবে প্রতীয়মান হবে। আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে মানুষের দাবী করার আগেই বা মানুষের নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করার আগেই, আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব,

মহত্ত্ব ও বিচারের ভাণ্ডার হতে মানব জাতিকে তা দান করেছেন। কারণ অদৃশ্যের জ্ঞাতা মহান আল্লাহ ভালোকরেই জানেন মাতৃ ভাষায় জ্ঞানলাভ ছাড়া মানব জাতি কোন দিনই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবে না। তাই আরব জাতির মাতৃভাষা আরবীতেই পবিত্র কুরআন নাযিল করে মানব জাতিকে ধন্য করেছেন। আলোচ্য রচনায় জাগ্রত বাংলার জনগণের মাতৃভাষার দাবীকে শুধু তাদের সন্তুষ্টির দাবী নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির দাবী হিসেবে প্রমাণের মাধ্যমে বাংলাভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের বুকে সমুন্নত করার প্রয়াস চালানোর সদিচ্ছায় এই মহোত্তম পুস্তকের অবতারণা।

সর্বান্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা (মাতৃভাষা) বাংলাভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশবাসীর অন্তরে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি সহ বিপথগামী বা পথভ্রষ্ঠ জীবন প্রবাহকে বিদূরিত করে পাপ মুক্ত বা আশঙ্কা মুক্ত জীবন যাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বর্তমান সুধী ও সচেতন সমাজে ধর্ম ও মাতৃভাষার নিবিড় একাত্মতা সাদরে গৃহীত হবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, পরম করুণাময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বইটি পড়ে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আর এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে কামনা করছি।

বইটি প্রকাশে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন,তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন। অনেক প্রচেষ্টার পরও বইটিতেকিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে পাঠক মহলের সুপরামর্শ কামনা করছি।

বিনীত লেখক
১/৩/০৭ ইং

ভাষার উৎস

ভূমণ্ডলের বুকে সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রধানত দু' ভাগে বিভক্ত (১) জীব ও (২) জড়। জীব বলতে যাদের জীবন আছে বা প্রাণ আছে তাদের কথা বুঝায়। যেমন মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ, জলজপ্রাণী ইত্যাদি। জীবের জীবন বা প্রাণ আছে, মৃত্যু আছে, বৃদ্ধি আছে, অনুভূতি আছে, ভাষা আছে সেটা বিভিন্ন ভাবে তারা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্ত করতে পারে। অপরদিকে জড়বস্তুর জীবন নেই বা প্রাণ নেই, মৃত্যুও নেই, কোন অনুভূতি নেই, ভাষা নেই, তাই তারা নির্বাক, কোন কিছু ব্যক্ত করতে পারে না। যেমন– কাদা, মাটি-বালু, পানি, বাড়ী-ঘর, চেয়ার-টেবিল, বই-পুস্তক, খাতা-কলম, স্কুল-কলেজ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি অসংখ্য জড় বস্তু সম্পূর্ণ নীরব-নিস্তব্ধ অচলভাবে একজায়গায় স্থির থাকে। এ অবস্থায় প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষই জড় জগত সহ সমগ্র জগতের অন্যান্য প্রাণীর ওপরও প্রাধান্য বিস্তার করে ইহজগত পরিচালনা করছে।

নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা জীব জগতের সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন অসহায় অবস্থায়। অতঃপর প্রত্যেককেই তার অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা দান করেছেন নিজ ইচ্ছানুযায়ী। তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই বিশ্বজগতের সকল প্রাণী জন্মের পর তাদের অভ্যন্তরস্থ অভিব্যক্তি ঘটায়। এতে হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণী, হাজার হাজার ভাব-ভাষায় তাদের জাতীয় পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করে। অতঃপর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা তাদের চাহিদা (খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান) পূরণ করে এবং পৃথিবীতে বসবাস করে। অবশ্য মানুষ তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে আলোচিত-বিবেচিত এজগতে। এজন্যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম প্রাণী মানুষের বিষয়টি একটু আলাদাভাবেই আলোচনায় আনব।

মানুষ ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রজাতির জীব বা প্রাণী বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে জলে-স্থলে, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, মরুদ্যান, বন, জঙ্গল, গহীণ অরণ্য ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকায়। এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ প্রজাতি অনুযায়ী উচ্চারিত আওয়াজ বা ভাষা আছে। গৃহপালিত পশু-পাখি, গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল, পায়রা, টিয়া, ময়না ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য বন্য সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, হাতী, ভাল্লুক, গন্ডার, শুকর, বানর, হনুমান, শিয়াল, হরিণ, খরগোস, কাঠবিড়াল ইত্যাদি

প্রাণী – যারা নিজ নিজ পৃথক পৃথক শব্দে বা ভাষায় তাদের মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। আমরা শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়েও তাদের ভাষা বুঝি না।

গৃহপালিত পশু-পাখির ভাষা বা কথাও বুঝি না, বন্য পশু-পাখির ভাষা বা ডাক বুঝি না। তবে নিশ্চিত ভাবে জানি যে, প্রত্যেক প্রাণী আলাদা আলাদা আওয়াজ দ্বারা তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে। যেমন গৃহপালিত গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, কুকুর-বিড়াল, ময়না, টিয়া, পায়রা ইত্যাদি প্রত্যেকের আওয়াজ বা অভিব্যক্তি আলাদা। কিন্তু নিজ নিজ প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ সকল গরুর ভাষা বা আওয়াজ এক জাতীয়, সকল কুকুরের ডাক এক জাতীয়, সকল ঘোড়ার আওয়াজ অভিন্ন, সকল মোরগ-মুরগী, কোকিল, ময়না, টিয়া, দোয়েল, কাক ইত্যাদি একই ভাবে আলাদা আলাদা ও সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দে নিজেদের মনের ভাব বা ভিতরের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে। বন্য পশুদের ক্ষেত্রেও এর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী হাজার হাজার ক্ষুদ্রতম হতে বৃহত্তম প্রাণী তাদের স্রষ্টা প্রদত্ত শব্দ আওয়াজ বা ভাষায় নিজেদের পরিচয় বহন করে। কাজেই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লহ তা'আলা তাদের সকল ভাষারও স্রষ্টা। মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়েও অন্যান্য প্রাণীর সঠিক সংখ্যা জানে না, তাদের কারো ভাষার অর্থ বোঝে না বা জানে না। তবে কিছু আন্দাজ ও অনুমান করার চেষ্টা করে, যা ত্রুটিপূর্ণও হতে পারে ক্রটিমুক্ত ও হতে পারে। একমাত্র আল্লাহই তাদের যাবতীয় বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খবর জানেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদ বা অধ্যায়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

এবার সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মানব জাতির অভিব্যক্তি নিয়ে পর্যালোচনা বা গবেষণা করলে আরও উন্নত প্রযুক্তি বেরিয়ে আসবে, তবে তা মোটেও সহজ নয়, বরং নানাবিধ জটিলতায় পরিপূর্ণ। অবশ্য সৃষ্টির প্রথমার্ধে মানুষের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ এবং ভাষার সংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু কালক্রমে দীর্ঘকাল অতীত হওয়ায় মানব জাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে বিপুল জনসংখ্যায় পরিণত হয় এবং ভূমণ্ডলের বিস্তীর্ণ ভূভাগের প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষ বসবাস শুরু করে। সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা, স্বাধীনতা, ভূভাগের বিশালত্ব ও দূরত্ব আবহাওয়ার তারতম্য, জ্ঞানের বিকাশ, শয়তানের সার্বক্ষণিক বিভ্রান্তিকর যোগাযোগ মানবজাতিকে বিভিন্ন ভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধা বিভক্ত করে দেয়। ফলে অনেক অসচেতন মানুষ তার আসল স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে নকল অনুসারে অন্ধ হয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ ধীরে ধীরে উন্নতির সোপান অনুসরণ করে উন্নত জীবনে প্রবেশ করে, আবার অনেকে নিম্মজীবন যাত্রাকে বাপ-দাদার আদর্শ ভেবে বা নিজের পছন্দ ভেবে, বিবেকের অজান্তে নিম্মস্তরে চলে যায়। মানব জীবনের এই পটপরিবর্তনে তার জ্ঞান-

বুদ্ধি, সচেতনতা-অসচেতনতা, মনোযোগ-অমনোযোগ, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, হিত-অহিত, বিশ্বাস অবিশ্বাস, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি অসংখ্য অনুভূতি প্রতিযোগিতা মূলকভাবে কাজ করে ফলে মানুষ এক জাতি হয়েও তার ভাষা, ধর্ম, নীতি-আদর্শ, জাতিগোত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, আহার, বাসস্থান ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলো এক ও অভিন্ন থাকে না। কালক্রমে এ গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত মতবিনিময় ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়।

কারণ বর্তমান পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ২০০ টি দেশে চার হাজারেরও বেশী ভাষা প্রচলিত আছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানবজাতির ভাষাও এক হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও বিকাশ সাধিত হওয়ায় ভাষা, শিক্ষা-সাংস্কৃতি, গবেষণা, ধর্ম ও বিবিধ কর্মকাণ্ডের সংখ্যা প্রায় একই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এগুলোর সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। যাহোক বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত চার সহস্রাধিক ভাষার এক হাজার সম্পর্কেও আমাদের মানুষ জাতির কারো কোন ধারণা নেই। মাত্র কয়েকটি ভাষার ধারণা নিয়েই আমাদের জীবন প্রবাহ। তবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বর্তমান চার হাজার ভাষা, ছয়শত কোটি লোকের মধ্যে দেশ ভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক ও এলাকাভিত্তিক সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যেকটি ভাষায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে বা নিজেদের জন্যে মাতৃভাষার পৃথক একটি ভাষা হিসেবে গণ্য।

তবে পৃথিবীর সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানুষের, সকল ভাষার স্রষ্টা ও শিক্ষক মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির ভাষায় সঠিক মর্মার্থে এক অভাবনীয় ও অবিচ্ছিন্ন সাদৃশ্যও সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে এক ভাষা ভাষির লোক অন্য ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে কয়েক ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে। পৃথিবীতে ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন বিরোধ নেই বা কোন বাধ্য বাধকতামূলক আইনও নেই, তাই জন্মের পর হতেই মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পছন্দের ভাষা দিয়েই জীবন যাত্রা শুরু করে, এ পছন্দের ভাষা বলতে মায়ের ভাষাকেই বুঝায়। সেহেতু মায়ের-ভাষায় স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাকে সে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং প্রতিটি ভাষার মূল উৎসই হলো (মানুষের) স্রষ্টা আল্লাহ। আর তাঁর প্রতিনিধি মাকে দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন। তাই প্রাণী জগতে তার গর্ভধারিণী নিকটতম মাতাকেই ভাষার উৎস মনে করা হয়। কিন্তু সঠিক অর্থে সকল ভাষার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক মহাজ্ঞানী এক আল্লাহই হলেন ভাষার উৎস।

মাতৃভাষার উৎস

মাতৃভাষার অর্থ স্বজাতীয় ভাষা, মায়ের মুখ থেকে বাল্যকাল হতে যে ভাষা শিক্ষা করা হয় বা মায়ের অনুসরণে যেসব কথা বলা হয় বা মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা। আমরা ছাত্র জীবনে পড়েছি বা শিক্ষক জীবনে পড়িয়েছি, মনের ভাব প্রকাশ করার নাম ভাষা, আর নিজ নিজ দেশের প্রচলিত ভাষার নাম মাতৃভাষা। এখানে লক্ষ্যণীয় হলো মানব জাতির মনের ভাব বা ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করার নাম হলো ভাষা। পৃথিবীতে ইংরেজি, বাংলা, আরবী, উর্দু, হিন্দী , পস্তু, ফারসী, চাইনিজ, কোরিয়ান, জাপানী, মালয়, রুশ, হিব্রু, ল্যাটিন, তামিল ইত্যাদি অনেক ভাষা প্রচলিত আছে। এসব ভাষা নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসীদের বা কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মনেরভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। সেজন্যে এসব ভাষা যে দেশ বা অঞ্চল বা জাতির জন্যে প্রযোজ্য বা যেখানে যা প্রচলিত আছে, উহাই সেখানের মাতৃভাষা। যেমন বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলা, পাকিস্তানের মাতৃভাষা উর্দু বৃটেনের মাতৃভাষা ইংরেজী, সৌদি আরব কুয়েত, আরব আমিরাত, ওমান, মিসর, ইরাক, ইরান , লেবানন প্রভৃতি দেশের মাতৃভাষা আরবী। এভাবে প্রত্যেক দেশ বা অঞ্চল তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ব্যবহার করে।

অবশ্য পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় ভাষা সংখ্যারও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বড় বড় দেশ বা রাষ্ট্রগুলোতে অনেক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, সেখানকার অধিকাংশ লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলে। কিন্তু আজ হতে ৫০/৫৫ বছর পূর্বে ছাত্রজীবনে পড়েছি, সমগ্র ভারতে ১১৮ টিরও বেশী ভাষা বা মাতৃভাষা চালু আছে। বর্তমানে এ সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আষ্ট্রোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান প্রভৃতি বড় বড় দেশগুলোর এক একটিতে জানা-অজানা অনেক ভাষা বা মাতৃভাষা প্রচলিত আছে। মাতৃভাষা কোন দেশ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য বা উন্নয়নের পথে কোন অন্তরায় নয়। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বহু সংখ্যক ভাষা বা মাতৃভাষা নিয়ে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ উন্নয়নের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বময়। কিন্তু আজ হতে ৫০/৫৫ বছর পূর্বে আমরা এদেশের মানুষ আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে যে সংগ্রাম করেছি, ইতিহাসের পাতায় চিরদিন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসিত উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রে

বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। আমরা (বাংলাদেশ) পূর্বপাকিস্তান নাম নিয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি। কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা তাঁদের আঞ্চলিক ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু পাকিস্তানীরা বা পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যাগোরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবীর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে উদ্ভুত আন্দোলন থামানর চেষ্টা করে। অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ও জনতা তাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষার দাবীতে আন্দোলন জোরদার করে মিছিল বের করে উহাতে ক্ষিপ্ত পাকিস্তানী শাসকরা মিছিলে গুলি চালায়, ফলে ঘটনাস্থলেই সালাম, রফিক, বরকত, জাব্বার সহ কয়েকজন ছাত্র শহীদ হন। দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী। মাতৃভাষার দাবরি প্রতি পাকিস্তানী হানাদারদের এই নির্মম ও পাশাবিক আচরণ আপামর জনতা কেউ মেনে নেই নি। সমগ্র দেশবাসী তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল সেদিন। পরবর্তীতে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার স্থাপিত হয় এবং প্রতিবছর শহীদদের স্মরণে ২১ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালিত হয়। এই দিনে শহীদদের সম্মানে শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পন করা হয় এবং তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

২১ শে ফেব্রুয়ারীর তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পরই এদেশের মানুষ পাকিস্তানীদের দ্ব্যর্থহীন স্বার্থের শাসন ও শোষনের প্রকাশ্য অবয়ব দেখতে পায়। অতঃপর আঞ্চলিক ভাষা, শিক্ষা, উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এক অভাবনীয় বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং উভয় অঞ্চলের মধ্যে মতপার্থক্য বাড়তে থাকে। পরিশেষে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ক্ষমতালাভে (পাকিস্তানীদের স্বার্থের অজুহাতে) বাধার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় এদেশের তৎকালীন আওয়ামী লীগেরই অদ্বিতীয় সংগ্রামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের (যুদ্ধের) প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। এরপর ঢাকায় রাজনৈতিক সংলাপ চলাকালে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসভবন হতে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে-যাওয়া হয়। এর পরপরই আরম্ভ হয়, রাঙালী ও পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের শেষভাগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়। বাংলাদেশের সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্য ও সমর্থনে মাত্র কয়েকদিনেই দেশের অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে। অতঃপর (১৯৭১ সালের) ২৫শে ডিসেম্বর পাকিস্তানী

সৈন্যদের আত্মসর্মপণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্রের অভ্যূদয় ঘটে।

আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছে মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি। এগুলি হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলির মধ্যে মা, মাতৃস্নেহ ও মাতৃভাষা সার্বক্ষণিকভাবে জীবনকে ঘিরে রেখেছে,কিন্তু মাতৃভূমি ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। যার বহুলাংশই আমাদের অদেখা, অচেনা, অজানাই থেকে যায় সারাজীবন। কিন্তু মাতৃভূমির এই বিস্তীর্ণ বা দূরবর্তী এলাকাকে কারও দূরবর্তী মনে হয় না, অজানা, অচেনা স্থানকেও অপরিচিত মনে হয় না, বিদেশ, দূরদেশ বা অন্যদেশের মত। যেমন আমাদের অনেকের বাড়ীর পাশেই বা ২/১ মাইল দূরে প্রতিবেশী দেশ ভারত। অথচ এই ২/১ মাইলকে হাজার মাইলের চেয়েও বেশী দূর মনে হয়। কারণ সেটা আমাদের নাগলের বাইরে বা আয়ত্বের বাইরে বা অধিকারের মধ্যে নয়। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের একটা জায়গা আমাদের বাড়ী থেকে হাজার মাইল দূরেও হয় তবুও তা আমাদের অতি নিকটে মনে হয়। কারণ এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের ও অধিকারের জায়গা, যে কোন মুহূর্তে, যে কেন যানবাহনে যে কোন সময় বাধাহীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারব এবং উক্ত ভূমিও আমাদের বাড়ী, গ্রাম, এলাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাতৃভূমি। আমরা মাতৃভূমিকে মায়ের মতই ভালবাসি এবং প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিয়েও মাতৃভূমিকে রক্ষা করব।

মা ও মাতৃভূমির মত মাতৃভাষাও আমাদের হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ, মাতৃভাষা বাংলা। এটি মুসলিম অধ্যুষিত একটি ছোট দেশ। এখানকার অধিকাংশ (প্রায় ৯৫%) লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে। স্বল্প সংখ্যক বিদেশী ও কিছু উপজাতীয়রা বাংলায় কথা বলতে পারে না। যারা বাংলায় কথা বলে তাদের চলতি বা প্রচলিত কথাবার্তা এক ও অভিন্ন নয়, বরং অনেকটা ভিন্ন ধরনের। দেশের দূরবর্তী জেলা ও অঞ্চলে এমন কি স্বল্প দূরের এলাকাতেও ভাষার বা কথাবার্তার মধ্যে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাতে (পার্থক্যের দরুণ) কোন অসুবিধা হয় না। দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষই মাতৃভাষার প্রতি তাদের আত্মতৃপ্তির প্রকাশ তথা ভিন্ন ভিন্ন ও অশুদ্ধ উচ্চারণের কথা ভালভাবে জানে এবং বোঝেও।

মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসা ও আত্মতুষ্টির ফলেই মাতৃভাষার উচ্চারণে বহুবিধ মাত্রা মনের অজান্তেই সংযোজিত হয়েছে। মাতৃভাষার মধ্যে এসব খামখেয়ালী, উদ্ভট অবান্তর ও হাস্যকর শব্দের অনুপ্রবেশ অনেকের অন্তরে আপত্তি বা অভিযোগের সৃষ্টি করে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কৌতুহল সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দুই উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুর মধ্যে

আলাপকালে তুই, তোর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ অন্তরঙ্গ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য – অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। অন্যান্য জায়গায়ও আন্তরিক পরিবেশে, গ্রামে সেকেলে কথা বা শব্দ ব্যবহার করা হয়। মাতৃভাষাকে প্রাণবন্ত রাখতে রেডিও, টেলিভিশন ও সাংবাদপত্রে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। যদিও সেখানে অনেক অশুদ্ধ অবান্তর, অলিখিত বা অব্যবহৃত ত্রুটিপূর্ণ শব্দ বা বাক্য স্থান পায়, তবুও মাতৃভাষার সার্বজনীন অধিকারে সেগুলো অবহেলিত হয় না।

মাতৃভাষা কোন সীমাবদ্ধ এলাকার ভাষা নয় বা কোন সীমিত ভাষাও নয়। এ ভাষা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এবং পারস্পরিক ভাবে তা স্বীকৃত ও অভিনন্দিত। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া সে বসবাস করতে পারে না, অন্যান্য সকল প্রাণীর চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রাধান্য ও কতৃত্ব রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিকতা ও মানবতার কারণে মানুষ জ্ঞানার্জনের প্রয়াসী। তাই স্বাভাবিকভাবেই এক দেশের মানুষ অন্য দেশে গমন করে এবং সেখানকার ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হতে জ্ঞানার্জন করে। তাছাড়া শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে আধুনিক ব্যবস্থায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগের দ্বার উন্মোচিত হয়। এতে নিজ নিজ চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী একে অপরের সঙ্গে শিক্ষা, সাংস্কৃতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে মাতৃভাষা আর মাতৃভূমিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। উহা পৃথিবীর যে কোন স্থানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বিস্তার লাভ করে।

বর্তমান বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র দেশ। এখানে গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৪৫ জন লোক বাস করে। তাই কর্মসংস্থানের সন্ধানে ও সুযোগে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক লোক বিদেশে কর্মরত আছেন। তাঁরা যে দেশে যাচ্ছেন সেখানকার মাতৃভাষা শিখছেন এবং তাদেরকে ও আমাদের ভাষা ও জ্ঞানের দ্বারা আকৃষ্ট করছেন। কিন্তু তাতে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসার কোন ত্রুটি হয় না। বিদেশে গিয়ে মাতৃভাষার বা মাতৃভূমির লোক পাওয়া গেলে তাকে অত্যন্ত সাদরে বরণ করে নেয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার খবরে দেখা যায়, আমাদের দেশের নেতারা যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশগুলো সফর করেন, তখন প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের নেতাদের সঙ্গে মাতৃভাষায় মত বিনিময়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন, আবার সমষ্টিগতভাবে সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা করা হয়। কেবল বাংলাদেশের নেতারাই

নন, অন্যান্য যে কোন দেশের নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যখন বিদেশ সফয় করেন তখন তাঁর দেশের প্রবাসী অভিবাসীগণ তাদের মাতৃভূমির নেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে মাতৃভাষায় মতবিনিময় করেন ও সন্তোষ লাভ করেন।

সামগ্রিক চিন্তা ও বিবেচনা হতে মাতৃভাষাকে হৃদয়ের এক বিশাল মহীরুহ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এর অগণিত শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা, ফুলফল ইত্যাদি অবিরাম গতিতে কাজ করছে মানব হৃদয়ে। শয়নে-স্বপনে, নয়নে, আহারে, বিহারে, চিন্তা-চেতনায়, চলায়, স্কুলে-কলেজে, ইবাদত-বন্দেগীতে, গান-বাজনায়, হাটে- বাজারে, কৃষিক্ষেত্রে শিল্প কারখানায়, দেশে-বিদেশে সর্বত্রই নিজ নিজ মাতৃভাষার ঢেউ দ্বারা আবৃত রয়েছে মানব জাতি।

মতৃভাষা হতে সৃষ্ট এই ঢেউ একটি অজ্ঞাত পরিচয় অদৃশ্য শক্তি, এ শক্তি সম্পর্কে সকল মানব ওয়াকিফহাল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ যখন তার চিন্তা ও গুপ্ত ভাষা শক্তি দ্বারা একটি সৎ ও সুন্দর পরিকল্পনা করে, তখনই মাতৃভাষার একটি অশুভ গোপন (শয়তানী) চক্র তাকে বাধা দেয় এবং বিপরীত অর্থাৎ অসৎ পরিকল্পনার সন্ধান দেয়। একজন একনিষ্ঠ ইবাদতকারী যখন পবিত্রাবস্থায় নামাজ পড়তে দাঁড়ায় তখনও মাতৃভাষার ঐ শয়তানী গোপন অদৃশ্য শক্তি তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে পুনঃ পুনঃ বিভ্রান্তির চেষ্টা করে। এভাবে সকল ভাল কাজে বাধার সৃষ্টি হয় একান্ত গোপনেই। অবশ্য কোন কোন সময় ঐ অশুভ প্রচেষ্টা অনেক ভাল ভাল পরিকল্পনা ও পরিকল্পককে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে মাতৃভাষারই অশুভ চক্রান্তে মানুষ যখন একটি অসৎ পরিকল্পনা নেয় তখন মাতৃভাষায় অপর এক গুপ্ত শুভ শক্তি তাকে ঐ পথ হতে ভাল পরিকল্পনার পথে আহ্বান জানায় এবং তাতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তী সময়ে চুপি চুপি তাকে ভাল পথেই ডাকে। এভাবে অবশ্য অনেকে দিক পরিবর্তনও করে, অর্থাৎ ভাল হয়ে যায়।

সুতরাং মাতৃভাষার নেপথ্য আন্দোলন ও আলোড়ন মানবজীবনের জন্যে এক গুরুত্ব পূর্ন অবদান। আমাদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও জাতীয় অগ্রগতির ও উন্নয়নে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। তাই মাতৃভাষা সম্পর্কে নিবিড় গবেষণা চালিয়ে তাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার মূল্যবান ও বিখ্যাত সাহিত্য সম্ভার ও জ্ঞানভাণ্ডারের রচনাবলীকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে সেখান হতে ও প্রচুর জ্ঞান আহরণের অবাধ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই। কিন্তু জ্ঞান হলো অসীম ভাণ্ডার এখান হতে সামান্য ও সুন্দর জ্ঞান সঞ্চয় করা অত্যন্ত কষ্টকর এবং সঠিক জ্ঞান লাভ করা আরও কঠিন। যারা এ পৃথিবীতে জ্ঞানার্জন করে যশস্বী হয়েছেন তারাও মহাবিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের তুলনায় নিজেকে সামান্য

জ্ঞানীই ভেবেছেন। স্যার আইজ্যাক নিউটন ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও জ্ঞানতাপস হয়েও নিজেকে কখনও পণ্ডিত ও জ্ঞানী ভাবেননি। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, "পৃথিবীর মানুষ আমাকে কি ভাবে জানি না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি মনে করি আমি একটি ছোট ছেলের মত সাগরের তীরে খেলা করছি আর খুঁজে ফিরেছি সাধারণের চেয়ে সামান্য আলাদা পাথরের নুড়ি বা ঝিনুকের খোলা। সামনে আমার পড়ে রয়েছে অনাবিস্কৃত বিশাল জ্ঞানের সাগর।"

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় কোন মনীষীই জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ ভাবেননি। কারণ জ্ঞানের পরিধি হলো সাগর মহাসাগরের বিপুল জলরাশির ন্যায় বিস্তৃত। সেখান হতে সামান্যই সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। আর সে সঞ্চয়টুকুও মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। অবশ্য বর্তমান অত্যাধুনিক বিশ্বে মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীতেও জ্ঞানার্জন ও গবেষণার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে তবে তা মাতৃভাষাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। মাতৃভাষার শীর্ষ অনুধাবন দ্বারাই অন্য যে কোন ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কিন্তু সব চাইতে রহস্যজনক হলো, মানুষ একটি ভাষা নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিল, অতঃপর কালের বিবর্তনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হয়ে আসাধারণ বস্তুসামগ্রীর আবিষ্কারের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানেরও উদ্ভব ঘটায় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর বয়সের এজগতে কয়েক হাজার ভাষার জন্ম হয়। তবে যত প্রকারের ভাষারই জন্ম হোক উহার স্রষ্টা একজন আছেনই, তিনি সকলের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহ। মানুষের জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরীক্ষার্থেই আল্লাহর ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় পৃথিবীতে প্রায় ৪/৫ হাজার ভাষার জন্ম হয়েছে। আল্লাহ সকল প্রকাশ্য ও গুপ্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত, তিনি ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি সমস্ত ভাষার অর্থবিশারদ বা পণ্ডিত বলে দাবী করতে পারেন। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জগত শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিশেষ কোন দেশ জাতি বা ভাষাকে উল্লেখ না করে সামগ্রিকভাবে জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে একেবারে সরল ও সহজ ভাষায় বলেছেন

الرَّحْمَنُ– عَلَّمَ الْقُرْآنَ– خَلَقَ الْإِنسَانَ– عَلَّمَهُ الْبَيَانَ–

'পরম করুনাময় আল্লাহ, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে (ভাব) ভাষা প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন' (৫৫ রহমান ১-৪)।

অন্যত্র মহান আল্লহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ– 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রিবাস্থিত ধমনী থেকে ও অধিক নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, –لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে' *(ত্বীন ৯৫/৪)*।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন-এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ, বাক্য (আয়াত), সূরা, আদেশ নিষেধ, ঐতিহাসিক কাহিনী সমূহ, বিশ্বশান্তি ও শিক্ষালাভের জন্যে পঠনীয়, অনুকরণীয় ও গবেষণাযোগ্য, পৃথিবীতে এর সমতুল্য কোন গ্রন্থ নেই। কারণ পৃথিবীর কোন মানুষ এর সত্বাধিকারী নয়। স্বয়ং মহাপরাক্রম শালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যিনি অকল্পনীয় উর্ধ্বজগতে নিজ সিংহাসনে সমাসীন আছেন, পবিত্র কুরআন হলো তাঁরই প্রেরিত বাণী। পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ মহামুল্যবান জ্ঞানসমৃদ্ধ একখানা অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থের সম্মান-মর্যাদা, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, রহস্য ও সার্বজর্নীন আবশ্যকীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক আমাদের আলোচনা মূল প্রতিপাদ্য মাতৃভাষা। আর মাতৃভাষার উৎস একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর আলোচনা। মাতৃভাষা মায়ের ভাষা, আর মা হলো আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন উপরোক্ত আয়াত কয়টি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে কোন ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং আল্লাহর দেয়া ভাষা বা মাতৃভাষা কোনটির কি নাম, তা নিয়ে আমাদের বিতর্কের কোন সুযোগ নেই। মায়ের মুখ থেকে যে ভাষা শিক্ষা করা হয় উহাই মাতৃভাষা। আমাদের জানা-অজানা পৃথিবীর যে কোন ভাষাই কোন না কোন মায়ের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা। তাছাড়া মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দিষ্ট ভাষার উল্লেখ না করায় পৃথিবীর ভাষাগুলো আল্লাহর নিকট সবই সমান মর্যাদার অধিকারী এবং তিনিই সবগুলোর স্রষ্টা।

মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ জগতে সবার নিকট মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চে। এ বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ মানব ও মনীষী আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে এক অমূল্য বাণী রেখে গেছেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক দিন একজন লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে লোকটি আবারও প্রশ্ন করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপর তোমার পিতা' (বুখারী)।

মাতা ও মাতৃভাষা সম্পর্কিত অপর এক হাদীসে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার নবী (সাঃ) এর দরবারে কতিপয় যুদ্ধবন্দী আসলো এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার স্তন দুধে ভরা ছিল। যখন বন্দীদের মাঝে সে কোন শিশু দেখতে পেত, তাকে জড়িয়ে ধরত এবং বুকে তুলে নিয়ে দুধপান করাতে থাকতো। নবী (সাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ধারণা, এ মহিলাটি তার আপন সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম না, না ফেলার ক্ষমতা থাকলে সে কখনো ফেলবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ মহিলাটি তার সন্তানের প্রতি যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী মেহেরবান – (বুখারী)।

একই মর্মার্থে মানব জাতির প্রতি তাদের একমাত্র স্রষ্টা পরম দয়াশীল আল্লাহর দয়ামায়া ও ভালবাসা সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা দয়ামায়াকে একশ ভাগ করেছেন। এর থেকে নিজের কাছে রেখেছেন নিরানব্বই ভাগ আর পৃথিবীতে নাযিল করেছেন এক ভাগ। (সৃষ্ট জগতের) প্রাণীকূল যে একে অপরের প্রতি দয়া মায়া দেখায় তা এ এক ভাগের কারণেই। এমনকি শাবক ব্যথা পাবে– এ ভয়ে ঘোড়াটি যে তার শাবকের উপর থেকে পা তুলে নেয়, তাও এ একভাগ থেকে পাওয়া দয়া-মায়ার কারণেই (বুখারী)। মা, মাতৃস্নেহ, মাতৃভাষা প্রভৃতি কথাগুলো উচ্চারণে সহজ হলেও উহাদের মর্মার্থ একেবারে সহজ নয়। এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য, মহত্ব সুগভীর।

উপরোক্ত হাদীস তিনটির প্রথমটিতে মায়ের মর্যাদার প্রতি অতুলনীয় ভক্তি প্রদর্শনের আহবান জানান হয়েছে মানুষের প্রতি। দ্বিতীয় হাদীস দুগ্ধবর্তী মায়ের সন্তানের প্রতি কিরূপ দয়া-মায়া ও ভালবাসা থাকতে পারে তা প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে আরও একটি জিনিষ পরিলক্ষিত হয়েছে। তা হলো মানুষের প্রতি কৃপাশীল ও দয়াশীল আল্লাহর দয়া মায়া ও ভালবাসার সাক্ষ্য।

উপরোক্ত আলোচনায় মাতৃভাষার গুরু হিসাবে মায়ের মর্যাদার অনুকূলে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচনায় মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্বেও মহানবী (সাঃ) এর জগদ্বিখ্যাত অবদানের বিষয় অবশ্যই আলোচনায় আসবে। যাহোক প্রাচীন পৃথিবীর বৃদ্ধির ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে জনসমুদ্রে পরিণত হয় আধুনিক বিশ্ব। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ভাষা ইত্যাদি সংখ্যারও বৃদ্ধি পায় অভাবনীয় ভাবে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় চার সহস্রাধিক ভাষার কথা বলা হয়েছে। আসলে পৃথিবীতে কত ভাষা আছে এটি কিন্তু এখনও নির্ণীত হয়নি। ভাষা তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, পৃথিবীতে কম পক্ষে দু'হাজার ভাষা আছে (তথ্য) সূত্র একুশের প্রবন্ধ ২০০৪ ও আলোচনা)। ভাষার এই মোটামুটি পরিসংখ্যান বা সঠিক পরিসংখ্যান যখন পৃথক পৃথক নামে লিপিবদ্ধ হবে বা খতিয়ান ভুক্ত হবে, তখন তো প্রত্যেক ভাষার এক একটা অঞ্চল, এলাকা বা দেশের মাতৃভাষা হয়ে যাবে। যদি কোন কারণে কোন ভাষায় কিছু পরিবর্তন বা উন্নয়ন করা হয়, সেটাও হবে ঐ মাতৃভাষার উৎস হতেই। তাছাড়া মাতৃভাষায় পণ্ডিত হতে না পারলে তো অন্য কোন ভাষাতে পণ্ডিত হওয়া যাবে না।

মাতৃভাষা সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। মাতৃভাষার পান্ডিত্যকে উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্যই তো অন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আমাদের জন্য সহজ, কিন্তু বিদেশী ইংরেজী, আরবী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা কঠিন। পক্ষান্তরে ইংরেজী ভাষীদের জন্য বাংলা, আরবী, উর্দু, হিন্দী কঠিন। অনুরূপ আরবী ভাষীদের জন্য আরবী সহজ কিন্তু ইংরেজী, বাংলা হিন্দী অবশ্যই কঠিন। এভাবে সমগ্র বিশ্বেই মাতৃভাষায় অনুকূল ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় প্রতিকূলতা বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান আধুনিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষার মতই বিদেশী অনেক ভাষাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষালাভ করে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আসলে সকল ভাষা বা মাতৃভাষার মর্মকথা তো এক ও অভিন্ন, এখানে কোন দ্বিমত নেই। যেমন একটি ছোট্ট বাক্য, 'আমি যাই' এতে আমার কোথাও যাওয়ার কথা

বোঝাচ্ছে। এ বাক্যটি বাংলায়, আমি যাই, ইংরেজীতে I go., আরবীতে اذهب, তিন ভাষার সবাই আলোচ্য বাক্যটি নিজ মাতৃভাষায় এক ও অভিন্নভাবেই বুঝবে, কোন দ্বিমতই হবে না। অবশ্য মাতৃভাষায় শেখা, বোঝা, গবেষণা করা, লিখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতটা সুবিধা পাওয়া যাবে অনান্য ভাষার ক্ষেত্রে ততটা অগ্রসর হওয়া কখনই সম্ভব হবে না। কারণ মাতৃভাষা মানুষকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। আর বিদেশী ভাষা অনেক পিছনে পড়ে থাকে। বস্তুত: মাতৃভাষার কোন মহানুভব ও সু-বৃহৎ চিন্তা বা পরিকল্পনা তাকে খুব তাড়াতাড়ী আরও অগ্রগতির পানে এগিয়ে নেয়, মানুষের অজান্তে এগুলো কাজ করে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় তা সম্ভব হয় না। এজন্যে জ্ঞানী বিজ্ঞানী পণ্ডিতরা তাঁদের যে কোন মূল্যবান প্রতিভাকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করে থাকেন। অতঃপর উহাকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রয়োজনীয় কল্যাণ সাধন করা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানব প্রতিভার এই অপ্রতিহত অদৃশ্য শক্তি চিন্তার পথে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। আর সে কারণেই বড় বড় সাহিত্যিক, পণ্ডিত, কবি, লেখকগণ মাতৃভাষার সাহায্যেই কল্পনা জগতে প্রবেশ করে বড় বড় অসাধারণ কাব্য রচনা করে থাকেন।

তাছাড়া প্রতিভার বিকাশ তো মাতৃভাষাতেই ঘটে থাকে এবং তার নমুনা বাল্য ও কৈশোরেই পাওয়া যায়। বাল্য ও কৈশোরে প্রতিভা বিকাশের অনেক বাস্তব কাহিনী আছে। এখানে সংক্ষেপ ২/১ টির উদাহরণ দিচ্ছি– আমি যখন ১৯৬৩ -৬৪ সালে কলেজে পড়ি তখন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইংরেজ কবি উইলিয়ম সেক্সপীয়রের একটি কবিতা পড়ানোর সময় শিক্ষক মহোদয় কবির জীবনীর উপর কিছু ভূমিকা দিতে গিয়ে কবির অসাধারণ প্রতিভার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত ছোট্ট মূল্যবান ও মজার কথা আজও হুবহু মনে আছে।

সেক্সপীয়র যখন কিশোর বয়সে স্কুলে পড়াশুনা করতেন, তখনই প্রসঙ্গ ক্রমে (মাতৃভাষা) ইংরেজী ছন্দে বা কবিতার সুরে কথাা বলতেন। তাঁর এ অভ্যাসের তীব্রতা দেখে, তাঁর বাবা বিরক্ত হয়ে ছেলেকে শাসন করার জন্য বেত নিয়ে প্রহার শুরু করেন। সেক্সপীয়র সে সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন,

Father father pity to take
Poetry I shall never make

পুত্রের এই কবিতা ছন্দে পিতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঐদিনহতে তিনি ছেলের প্রতি কঠোর শাসন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আশান্বিত চিত্তে বিশ্বাস করেছিলেন তার ছেলে একদিন মানুষের মত মানুষ হবে। সত্যিই বিশ্বের ইতিহাসে উইলিয়ম সেক্সপীয়র এক বিস্ময়। তিনি সর্বকালেল সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কবি হিসাবেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। মাতৃভাষায় যশস্বী এই মহাকবিও মায়ের র্মযাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য As you like it নাটকে মায়ের নামকে অমর করে রেখেছেন।

মাতৃভাষা মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, অপ্রতিদ্বন্ধী প্রতিভার নিদর্শন ইংরেজ কবি উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নমুনা তার বাস্তব উদাহরণ। পৃথিবীতে এরূপ বহু প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়েছে মাতৃভাষায়। আমাদের বাংলাদেশেও বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক মাতৃভাষায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অদ্ভুত প্রতিভা তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনে আকৃষ্ট করতে পারেনি। স্কুলে তাকে ভাল লাগে না, তাই বাড়ীতেই শিক্ষক রেখে গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে এগিয়ে চলে পড়াশুনা ও কবিতা লিখার কাজ। মাত্র তের বৎসর আট মাস বয়সে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম স্বনামে কবিতা ছাপান হলো হিন্দুমেলার উপহার। ধীরে ধীরে কৈশোর উত্তীর্ণ হলো রবীন্দ্রনাথের। অভিভাবকদের উচ্চ শিক্ষাদানের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পড়াশুনার পরিবর্তে বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন সাহিত্য চর্চা ও নাচে-গানে। কবির মন তখন নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। লিখলেন গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। অতঃপর তরুণ কবির হাতে ঝর্ণা ধারার মত কবিতা রচিত হতে থাকে এবং ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেগুলো বের হতে থাকে।

নিজের দেশ, দেশবাসী ও মাতৃভাষার প্রতি ছিল কবিগুরুর গভীর-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তাঁর অভাবনীয় প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে শান্তি নিকেতন আর শিলাইদহে। সেখানেই তিনি রচনা করেন গীতাঞ্জলী। বিলেতে এসে কবির সাথে পরিচয় হয় ইংরেজ কবি ইয়েটস-এর। ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ। তিনি এর ভূমিকা লিখলেন। ইন্ডিয়া

সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হলো গীতাঞ্জলী। ইংল্যান্ডের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, কাগজে কাগজে উচ্ছসিত প্রশাংসা।

কবি বিলাত থেকে আমেরিকা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখানকার পরিবেশ ভাল লাগাল না, ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। **১৫ই নভেম্বর ১৯১৩** সাল। সন্ধ্যাবেলায় খবর এল কবি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই প্রথম প্রাচীনবাসী যিনি এই পুরস্কার পেলেন।

কবিগুরুর আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে মাতৃভাষা প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। এভাবে মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার বহু নিদর্শন মিলবে বিশ্ব ইতিহাসে।

যারা মাতৃভাষার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে অন্য কোন বিদেশী ভাষাকে মাতৃভাষার স্থলে বা তদুর্ধ্বে স্থান দিয়ে, সেই ভাষায় নিজের জ্ঞান দ্বারা সাহিত্য সাধনা করতে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা সেই (বিদেশী) ভাষার মাঝদরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু খেয়ে তীরে ফিরে এসেছেন। অতঃপর সেই মারাত্মক ভুলের বিনিময়ে দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনাও হাহুতাশ করে মাতৃভাষার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। এরূপ বহু ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ কিংকর্তব্য বিমূঢ় ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশেই জন্মগ্রহণ করে মাতৃভাষার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। অতঃপর আশা পুরণে ব্যর্থ হয়ে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নিজ জীবনের স্বার্থকতা অর্জনে সক্ষম হন।

মাতৃভাষার এই অবিস্মরণীয় কবির নাম মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি **১৮২৪** খ্রিষ্টাব্দের **২৫** জানুয়ারী যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবনের শেষে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ জন্মে। **১৮৪৩** খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নামের প্রথমে যোগ হলো মাইকেল। পাশ্চাত্য জীবন যাপনের প্রতি প্রবল ইচ্ছা ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনায় তীব্র আবেগ তাঁকে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র কষ্টকর অভিজ্ঞতায় তাঁর এই ভূল ভেঙ্গেছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটে। তাঁর অমর কীর্তি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সনেট প্রবর্তন করে তিনি বাংলা সাহিত্যে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা।

মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্বকে প্রমাণ করার প্রয়াসে এই আলোচনাটি আরও একটু জানা দরকার। মধুসূদন যখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে দূর প্রবাসে ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি তাঁর মনে জাগায় দারুন কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন তাঁর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কত দেশ, কত নদ নদী তিনি দেখেছেন কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মায়ের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন? নদের কাছে তাঁর সবিনয় মিনতি, বন্ধুভাবে তাঁকে তিনি স্নেহাদরে যেমন স্মরণ করেন। কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে সস্নেহে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ যেন তাঁর স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করে। কপোতাক্ষ নদ নামক কবিতার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর এই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন।

কবি মধুসূদন দত্তের জীবনে ইংরেজী প্রীতি বা ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার স্বপ্ন, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তিনি যদি তাঁর এই প্রতিভাকে প্রারম্ভিক জীবন হতে তাঁর সাধনার কাজে লাগাতেন তবে হয়ত বাংলা সাহিত্য ও কাব্য জগতে আরও কিছু নতুনত্বের ধারা বয়ে আনত। কিন্তু তাঁর এই ভ্রম তাঁকে গভীর ভাবে ব্যথিত করলেও, সমগ্র মানব জাতি, বিশেষ করে আমাদের বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে মাতৃভাষা হতে বিচ্যুত না হওয়ার এক অজানা ও অকল্পনীয় শিক্ষা বিস্তার করে গেছেন, যা কোনদিন ও ভুলবার নয়।

ভুল মানব জীবনের নিত্য সঙ্গী, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব বিলীন করার মত ভুল করলে, তা হবে মীরজাফরের বাংলার স্বাধীনতা বিক্রির মত একটি আত্মাঘাতী পদক্ষেপ। অনুরূপ ভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভুলের বিষয়টিও তাঁর ব্যক্তিগত আত্মবিলাপ মূলক কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ হতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর ঐ আত্মঘাতী পদক্ষেপ হতে সৃষ্ট ভুল নিজেরই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে বিপর্যস্ত করেছে। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধ করার প্রয়াসেই মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে ব্রতী হয়েছি।

শিক্ষার পাশাপাশি অনান্য কল্যাণমূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তাদের অগ্রগতির প্রযিযোগিতা চলে এবং এক সময়ে তাদের মূল্যায়ন করে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়। যেমন বিভিন্ন ব্যাংক, বীমাকর্পোরেশন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, বিভিন্ন এন,জি,ও সংবাদ মাধ্যম প্রভৃতি। কার্যত এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থাননির্ধারণী ব্যবস্থার কারণে এগুলো গতিশীল রয়েছে।

শ্রেষ্ঠত্বের এই আকাংখা হতে লেখনীর জগতেও মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু সেখানেও মাতৃভাষায় পাণ্ডিত্য ছাড়া পৃথিবীর কোন লেখক, অন্য ভাষায় পাণ্ডিত্যের শীর্ষে সম্মানিত হতে পারেন নি। অদৃশ্যের জ্ঞাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই পৃথিবীতে তাঁর বিধিবিধান আদেশ-নিষেধ প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে যেসব নবীরাসূল প্রেরণ করেন এবং তাঁদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেন, তা তাঁদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী, তাই স্বয়ং আল্লাহই কুরআনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মূল্যায়ন করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বর্ণিত ভাষা আরবীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেননি। তবে কেউ যদি আরবীকে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের বা আল্লাহর বাণীর মর্যাদায় সম্মান দেয় বা আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এসম্পর্কে কোন বাধ্যতামূলক আদেশ নেই যে, আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করতে হবে। বরং দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় অনুশীলনী নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু অর্জন করা বাধ্যতামূলক।

পৃথিবীর স্বার্থে গভীর জ্ঞানলাভের জন্য যে কোন সুবিধাজনক ভাষায় শিক্ষালাভে কোন বাধাবিপত্তি নেই। আর পৃথিবীর কোন ভাষাকেই সর্বমহান আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে কোন সংবাদ (অহি) প্রেরণ করেননি। পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধার্থে ইংরেজীকে আন্তর্জাতিক ভাষায় মান দেওয়া হয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভাষায় নয়।

আমাদের পূর্বালোচিত ইংরেজী ভাষার অন্ধ অনুসারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে আকৃষ্ট হননি। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আকর্ষণেও নিজ অসামান্য প্রতিভাবলে ইংরেজী সাহিত্যকে সহজে আয়ত্ব করার দুর্বার আকাঙ্খায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অপরিচয়ের অকূল জনসমুদ্রে মাতৃভাষার স্বপ্নছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাননি। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাতৃভাষাতেই তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়েছিল।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিধি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবদান রেখে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা সবাই মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা করে গেছেন। তাছাড়া মহান রাব্বুল আলামীন পথহারা মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য এবং দুনিয়ার বুক থেকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার-ব্যভিচার, অসত্য, অধর্ম, কুসংস্কার এবং মানবিক

বিপর্যয়ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে প্রায় লক্ষাধিক নবীরাসূল প্রেরণ করেন। এই সব নবী-রাসূলদের অনেকের কাছে অনেক ছোট-বড় কিতাবও নাযিল হয়েছিল, সে কিতাবগুলো তাঁদের মাতৃভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও সর্বশেষ নবীর মাতৃভাষাতেই অবর্তীণ হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কুরআন যাঁর নেতৃত্বে যে দেশে অবর্তীণ হয়েছে, 'তাদের মাতৃভাষা আরবী' তাই আরবীতে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বমহান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাদেশে করেন যে,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ-

'এইভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ পাশের লোকদের সর্তক করেন এবং সর্তক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (শূরা ৪২/৭)।

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

'আলিফ লাম-রা, এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার' (ইউসুফ ১২/১২)।

প্রকৃত মহাসত্য হলো কুরআন তো মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ হেদায়েতের জন্য, বাস্তবায়নের জন্য একজন উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতের দরকার। এ সুদক্ষ ও সুনিপুণ পণ্ডিতের সঠিক সন্ধান ও সংবাদ তো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি তাঁর মহাজ্ঞানের আলোকে সঠিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞানী পণ্ডিত হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে নির্বাচন করেন। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর, হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর জ্ঞানের আলো ছিল আনাবিল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলতার শীর্ষে। এই তুলনাহীন জ্ঞানের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হিসাবে নির্বাচিত করে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কুরআনের ধারক স্থির করেন।

এই মনোনীত নবী ও রাসূল নিরক্ষর হওয়ায় নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় ওঠে, কিন্তু বাস্তবতার আলোকে তা ভিত্তিহীন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত দান করে অহি প্রেরণ করতে

থাকেন, অতঃপর তাঁকে অবহিত করে দেন যে, তাঁর বোধগম্যের জন্যেই তাঁর ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আরবের সাধারণ লোকদের উৎসাহিত ও অণুপ্রাণিত করার জন্যে পৃথক ভাবেও তাদেরকে জানান হয় যে, কুরআনকে ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্যই তাদের মাতৃভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। উপরের আয়াত দুটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বস্তত ঃ আলোচ্য রচনার মূল শিরোনাম 'ইসলাম ধর্ম ও মাতৃভাষা' এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের নির্বাচিত ভাষা। উভয়ের মধ্যে একটা নীতিগত সাদৃশ্য থাকার আলোচনাটিকে গুরুত্বাকারে নিয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রয়াস চালাচ্ছি। আলোচ্য পুস্তকের নাম 'ইসলাম ধর্ম ও মাতৃভাষা' দেয়ার নেপথ্যে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে, তা অধিকাংশ পাঠক বুঝে ফেলবেন। বাংলাদেশের মানুষকে মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে হয়েছে।

আসলে মাতৃভূমিকে সবাই ভালবাসে। দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ নেই যে তার মাতৃভূমিকে বা মাতৃভাষাকে ভালবাসেনা। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, হে মক্কা! তুমি আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বোত্তম।

তিনি শৈশব কাল থেকেই তাঁর জম্মভূমিকে দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণ সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর এই স্বপ্নের সঙ্গে মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর পরিকল্পনা মিলে যায়। ফলে তাঁর মাতৃভাষা আরবীতেই কুরআন নাজিল হয়। এর ফলে মক্কার কাফেররাও অহির অর্থ ভালভাবেই বুঝত, কিন্তু তারা নিজেদের আত্মম্ভরিতার কারণে স্বীকার করতো না। এমনকি তারা তাদের মিথ্যাদাবী, অহংকার, পেশীশক্তি ও দুঃশাসনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে নবী (সাঃ)-কে উৎখাতের বহু ষড়যন্ত্র করেছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলার মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে আল্লাহর ইচ্ছায় নবী (সাঃ) কে মক্কা হতে মদীনায় হিজরেত করতে হয়। সেখানে কিছু কাল অবস্থানের পর তিনি সেখানে একটি স্বাধীন ইসালামী রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধির ও বিচক্ষণতার সাথে মোহাজের আনছার, ইহুদি, খ্রিষ্টান সকলের সাথে সৌহার্দ পূর্ণ আচরণ করেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসীদের প্রতিহিংসা ও শত্রুতায় কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐসব সংঘাতময় দুর্দিনে তিনি যে সাহস, বীরত্ব, ধৈর্য, মানবতা, কঠোরতা, সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। পৃথিবীর বুকে একমাত্র তিনিই তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে অবিচার, ভেদাভেদ, হানাহানি ও

সমুদয় পাপাচার ঘুচিয়ে এক নিরাপদ শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিশেষে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিনা যুদ্ধে তাঁর মাতৃভূমি মক্কার বিজয় দান করেন তিনি মক্কায় প্রবেশ করে শত্রু মিত্র সকলকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন, অতঃপর দুর্দিনের আশ্রয় দানকারী মদীনাবাসীদের হৃদয়ের ভালবাসার দাবীকে সমুন্নত রাখার জন্য সেখানে ফিরে যান। সেখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

উল্লেখ্য, যুবক মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুরূপ মাতৃভাষার দাবী নিয়ে আমাদের দেশের যুবকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, অন্য ভাষা-ভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। তাদের দাবীর সূত্র ধরে বিভিন্ন কারণে আমাদের রাজনীতিবিদরাও সংগ্রামী যুবকদের সঙ্গে, মাতৃভাষার মুক্তির সঙ্গে; মাতৃভূমিরও মুক্তি তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর প্রায় নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আমাদের মাতৃভাষার দাবীর সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবীও পূরণ হয়। আমাদের অর্জিত বিজয় বা স্বাধীনতার লক্ষ্য নবী করীম (সাঃ)-এর ন্যায় এক ও অভিন্ন না হলেও তাঁর নীতির অনুসরণীয়। নবী (সা:) এর মাতৃভাষায় মহাসংবিধান কুরআন নাযিল হয়।

বলা আবশ্যক, মহানবী (সা:) শুধু আরব জাতির নেতা ও নবী নন, তিনি সারা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশের নেতা ও নবী। তিনি মানব জাতির জন্য সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহানবী (সা:)-এর অকৃত্রিম নির্লোভ দেশপ্রেমের আদর্শ যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরাও যেন তাঁর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও আদর্শ দেশ হিসেবে গড় তুলতে পারি নবীজির আদর্শে। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ যেন সবার সুখশান্তির নিরাপদ আবাসস্থল হয়। এটাই হোক আমাদের সবার লক্ষ্য ও প্রার্থনা।

আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছি। তার অনেক পরে আজকে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাভাষা স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের বাংলাভাষার দাবী ছিল ন্যায়সঙ্গত। উপরোক্ত আলোচনায় আরববাসী ও সমগ্র বিশ্ববাসীর মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে প্রাপ্ত ঐশী বাণীর মর্মকথাও মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয় এবং সন্দেহাতীতভাবেই তা সত্য। সুতরাং মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্বে দ্বি-মত পোষণের কোন অবকাশ নেই।

মাতৃভাষার ঐতিহাসিক অবদান

মাতৃভাষার ঐতিহাসিক অবদানও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ইতোপূর্বে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু রাসূলের মাতৃভাষায় কুরআন নাযিল, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মনে রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআন একটি বিশ্ব ধর্মগ্রন্থ, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শনের জন্যই এ মাহগ্রন্থের উপস্থিতি।

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্ম প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে মক্কা নগরীতে প্রেরণ করেন। অতঃপর নবুওয়াত দান করে অহি প্রেরণ শুরু করেন। নির্বাচিত নবী (সাঃ)-এর মাতৃভাষা আরবী এবং আরব জনগণের ভাষাও আরবী। তাই আরবীতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারী আরববাসীগণকে তাঁদের মাতৃভাষায় কুরআনের পাণ্ডিত্য প্রদান করে তা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করাই ছিল মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন করার সুবিধা অনেক, যা স্রষ্টা মহাজ্ঞানবাণ আল্লাহই বেশী জানেন। আল্লাহ তা'আলা, কুরআন, নবী (সা:), সত্য মিথ্যা ইত্যাদি জ্ঞানার্জনে মাতৃভাষাকে যেভাবে কাজে লাগাতে পারবে তা অন্য ভাষায় অসম্ভব। আর এ তথ্যটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

মানব হৃদয়ের গোপনে সংরক্ষিত এই মহাসংবাদের অবলম্বনেই মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে বসাতে পবিত্র কুরআনকে মাতৃভাষায় রূপদান করা হয়েছে। যারা এর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করবে, তারা তার সমুচিত বিনিময় প্রাপ্ত হবে। এসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পবিত্র কুরআনের বিশাল কলেবরে ও নবী (সাঃ)-এর অসংখ্য হাদীসে বিশদভাবে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। অদূর ভবিষ্যতে মহাগ্রন্থ আল–কুরআন এবং হাদীস আরবী ভাষা হতে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বের অনান্য দেশে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় রূপধারী হবে এটাও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

তবে যাদের মাতৃভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাদের দায়িত্বের বিষয় মানবজাতির পালনকর্তা ও অভিভাবক আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বার বার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবাহিত করেছেন। মাতৃভাষায় জ্ঞান থাকার পরেও

কুরআনের আদেশ নিষেধ ও অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ বাণীর প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞার কোনই সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি। মাতৃভাষায় কুরআন অনুধাবন করার প্রয়াসেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-কে ও আরববাসীকে লক্ষ্য করে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশ করে বলেন,

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً–

'আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সর্তক করেন' (১৯ মরইয়াম-৯৭)।

সাদৃশ্যপূর্ণ মর্মার্থে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

حم– وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ– إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ–

'হা–মীম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের আমি একে করেছি কুরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ' (৪৩ যুখরু ১–৩।

আরবদের মাতৃভাষা আরবীতে কুরআন তাদের জন্যে মোটেও কঠিন নয়, এই মর্মের প্রত্যাদেশ হলো, قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ– 'আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে' (৩৯ যুমার–২৮)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

حم– عسق– كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ–

'হা-মীম, এটা অবতীর্ণ পরমকরুণাময় দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াত সমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী (ভাষায়) কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী রূপে' (৪১ হা-মীম সিজদাহ ১–৪)।

অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ জানেন ও দেখেন। একই সঙ্গে অন্তরের বিষয়ও সমপরিমাণই জানেন ও দেখেন। মানুষের মুখের ও মনের ভাষা এক ও অভিন্ন। কাজেই মানুষ সৎপথে চালিত হলেও মুখের ও মনের ভাষা দ্বারাই চালিত হয় এবং অসৎ পথে চালিত

হলেও মুখের ও মনের ভাষার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে চলে। তবে মুখের চেয়ে মনের ভাষার শক্তিই অধিক শক্তিশালী। তাছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠ ক্ষতিসাধনকারী শত্রু শয়তান অধিকাংশ সময়ই মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। বিশেষ করে ভাল কাজের ক্ষেত্রে শয়তানের উপস্থিতি অসামান্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছালাতে দণ্ডায়মান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকেও শয়তান বিভ্রান্ত অথবা অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করে। শয়তানের এই প্রচেষ্টার কথাও আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, 'গোপন পরামর্শ তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, বিশ্বাসীদের দুঃখ দেওয়ার জন্য তবে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা' (৫৮ মুজদালাহ-১০)। অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "শয়তান ওদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার করেছে, আর আল্লাহর স্মরণ থেকে ওদের ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে' (৫৮ মুজদালাহ-১৯)। পরপর দুটি আয়াতের প্রথমটিতে শয়তানের ব্যর্থতা ও দ্বিতীয়টিতে শয়তানের সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।

নবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে শয়তানের প্রভাবেই এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়ে বহু দেব-দেবী উপাসকরূপে আবির্ভূত হয় এবং মক্কার পবিত্র কা'বা ঘরেও দেব-দেবীর মূর্তিস্থাপন হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হতেই আরবদের মাতৃভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী হিসাবে, উহার অর্থ জটিল বা অবোধ্য হতে পারে এরূপ ধারণাকে দূর করা প্রয়াসেই উপরোক্ত আয়াতগুলোর দ্বারা মাতৃভাষায় কুরআনের বর্ণনাকে অনায়াস সাধ্য বলা হয়েছে।

আল্লাহর মনোনীত আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)ও ছিলেন নিরক্ষর ও সত্যবাদী। পবিত্র অহি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর হৃদয়ে ভীতি ও শঙ্কা সর্বদাই কাজ করত। তবে তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্য ছিল সত্য ও ন্যায়ের পথে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম। আল্লাহ তাঁকে সে জ্ঞান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞান আহরণ প্রত্যেক মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ'। নবী (সাঃ) জ্ঞানী ও জ্ঞানআহরণকারী নারী–পুরুষকে ভালবাসতেন। এ কারণেই তিনি বুদ্ধিমতী হযরত খাদীজা (রাঃ) -এর পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। এই মহীয়সী মহিলাই সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কতৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনিই পবিত্র কুরআনের

অবতীর্ণ অহিতে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর এই অনুভূতির অন্তরালেও ছিল মাতৃভাষারই অবদান।

এটা স্বতঃ সিদ্ধ যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মৌলিক চাহিদাগুলোর বেশ কিছু উৎস আছে, যেমন পানির উৎস সমুদ্র, আলো ও তাপের উৎস সূর্য, পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি। তদ্রুপ জ্ঞান ও শিক্ষালাভের উৎস মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া পৃথিবীতে কোন মনীষী বা জ্ঞান তাপস তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন নজির রেখে যাননি। পৃথিবীর সকল ধর্মপ্রচারক, ধর্মযাজক, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক, দিগ্বিজয়ী, সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও অনান্য পণ্ডিতগণ সবাই মাতৃভাষায় তাঁদের অমর প্রতিভা রেখে গেছেন। এমনকি আমাদের শেষ নবী (সাঃ) এর পূর্বের পৃথিবীতে হাজার হাজার নবীর আগমন ও তাঁদের ধর্মপ্রচার ছিল নিজ নিজ মাতৃভাষায়। বিশ্বজগতে মাতৃভাষাই জ্ঞানের সর্বোচ্চ বাহন প্রমাণার্থে মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ–

'আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতীর ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' (১৪ ইব্রাহীম -৪)।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে প্রথম পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সে জনগণকে সঠিক পথে বহাল রাখতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান তথা শরী'আত অবতীর্ণ হয়েছে। কালক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত হয়েছে। অবস্থার পেক্ষাপটে ও প্রয়োজনে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ-তা'আলা যেখানে নবী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেখানেই তাদের (সেই এলাকার) ভাষাভাষী নবী প্রেরণ করেছেন। কারণ নবীদের প্রধান কাজ আল্লাহর প্রেরিত বার্তা লোকদের

মাঝে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া ও তা বুঝিয়ে দেওয়া। জিবরাইল (আঃ) এই বার্তা নিয়ে আসতেন এবং নবীদেরকে তাঁদের ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন।

আমাদের শেষ নবী (সাঃ)-এর আগমণের পূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা ও দেশ বা এলাকা কিছুটা সীমিত বা অল্প ছিল। তাই তখন এলাকা ও জাতি বা গোত্র ভিত্তিক নবী মনোনীত হতো। ফলে তাঁদের মাতৃভাষায় কিতাব পেয়ে ধর্মপ্রচার ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু শেষ নবীর আমলে দেশ জাতি ও ভাষার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হলেও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এক রাসূল, এক গ্রন্থ, একও অভিন্ন শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে শত বিরোধ সত্ত্বে ধর্মীয়, চারিত্রিক, নৈতিক, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের মহান লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে তাঁর মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ কিতাব প্রদান করা হয়। এই মহাগ্রন্থের অসীম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, এতে সকল যুগের প্রায় অনেক নবী-রাসূলের কিতাবের উল্লেখ ও সমর্থন রয়েছে। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রাসূলই এই শ্রেষ্ঠ মহানবী (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থের (কুরআনের) সুসংবাদ জানতেন। এই মহাসংবাদগুলো প্রসঙ্গ ক্রমে কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন,

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً
لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ–

‘এর আগে মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শন ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে যালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়’ (৪৬ আহকাফ–১২)

ইষৎ পরিবর্তিত আকারে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে।

‘নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। নিশ্চয়ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে। তাদের জন্যে কি এটা নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলদের আলেমগণ এটা অবগত আছে? যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন তবে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না।’ (২৬ শু'আরা ১৯১–১৯৯)।

আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতি আরও দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের উপর অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহাঅনুগ্রহ’ (৩৫ ফাতির -৩১, ৩২)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা (কুরআনের) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের ও নবী-রাসূলদের সুসংবাদ পাওয়া যায়। তাঁদের কিতাব সমূহও ছিল সাধারণ মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। তাঁদের অধীনস্থ অনেক গোত্র বা সম্প্রদায়ের অসদাচরণ ছিল আশাতীত ও দুঃখজনক, যেগুলো পবিত্র কুরআনে সহজ ও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক নবী-রাসুলের জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন আসমানী গযব দ্বারা শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এদের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম, হযরত হুদ (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ) এর জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবার শীর্ষ স্থানে রয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) এর প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়নকারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়। এদের মধ্যে একমাত্র ফেরআউন ব্যতীত সবারই ধ্বংসকাহিনীর নমুনাগুলো আজও পৃথিবীকে আতঙ্কিত রেখেছে। সেগুলো হচ্ছে বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, বজ্র বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ঐসব ধ্বংসকাহিনীগুলোর পর পৃথিবীতে অনুরূপ নমুনার ধ্বংসযজ্ঞ একেবারে থেমে যায়নি। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই হোক অথবা সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই হোক বা শিক্ষা দানের জন্য হোক আজও পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছে নির্মম ভাবে।

বর্তমান বিশ্বের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা হ্যারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতির আঘাত নিঃসন্দেহে জনজীবনে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এনে দেয়। কিন্তু মানুষের বলার করার কিছুই থাকে না, বাকরূদ্ধ হয়ে যায় সকলের। এতে প্রাচীন কালের ধ্বংসকাহিনীগুলোর প্রতি অনুপম বিশ্বাস জন্মে বলে ধারণা করা যায়। এই বাস্তব সত্যের মত প্রাচীন নবী-রাসূলদের ধর্মীয় ও মানবতা বহনকারী সংবাদগুলোও সত্য এবং আমাদের মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের মহাসংবাদগুলিও

সন্দেহাতীতভাবেই সত্য। পবিত্র কুরআনের আয়াত বা বাণী বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ– 'আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর' (২১ আম্বিয়া-২৫)।

অনুরূপ অন্যত্র এ মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ– 'আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?' (২১ আম্বিয়া -১০)।

পবিত্র কুরআন হতে শিক্ষামূলক ও উপদেশ গ্রহণ মূলক আয়াতগুলো যে মোটেও কঠিন নয় এ মর্মে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ– 'আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?' (৫৪ কামার -১৭)।

মানব জাতির জন্য তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা সহজ। এটা স্বয়ং মানুষ ও তার ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই বাণী। আমরা তো মাতৃভাষাকেই সর্বাধিক সহজ ভাষা মনে করি। এরপর মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা মাতৃভাষাকে জগতের বুকে সহজ ভাষা হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ায় মানব জাতির মধ্যে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মাতৃভাষাতেও কিছু জটিলতম শব্দ, বাক্য ও অধ্যায় আছে। কিন্তু সেটা যে কঠিন তা অনুভব করার ক্ষমতাও মাতৃভাষাতেই রয়েছে পুরোপুরি। কিন্তু মানব সংকলিত কোন শব্দ, বাক্য বা অধ্যায়ে শেষ পর্যন্ত কোন সমস্যা থাকবে না। পবিত্র কুরআনের বাণী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ বাণী শ্রেষ্ঠবাণী।

এখানে কিছু জটিলতা থাকতে পারে। কারণ তিনি অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের অধিশ্বর, তাঁর অথৈ জ্ঞানের প্রতি মানুষের একটা চিন্তা থাকটা খুবই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণাও করে দিয়েছেন।

'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার

এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যে কার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না' (৩ ইমরান-৭)।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'আলিফ লাম রা ইহা কিতাবের স্পষ্ট আয়াত' (১২ ইউসুফ-১০)।" আলিফ লাম-মীম-রা, এগুলো কুরআনের আয়াত' (১৩ রাদ-১)। আলিফ লাম রা এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি' (১৪ ইবরাহীম-১)। আলিফ-লাম-রা এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত' (১৫ হিজর-১)। এ রহস্যময় আয়াতগুলোর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অথাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে এর ব্যাখ্যা করা কখন সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলোকে বিশ্বজগতের দৃষ্টিতে আসমানের সৃষ্টি সবচেয়ে কঠিনতর এবং উহার গুরুত্বও সর্বাধিক। তদ্রুপ পবিত্র কুরআনেও কিছু উন্নত অবোধগম্য আয়াত আছে, যা সমস্ত কুরআনের তুলনায় অনেক কঠিন। কিন্তু আমাদের জীবন প্রবাহের পথে কোন জটিল বা প্রতিবন্ধক আয়াত নেই।

আয়াতগুলো আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় অবতীর্ণ হলে আমাদের জন্যে যেমন সহজ হতো, আরবদের মাতৃভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় তাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। এমনকি কুরআনের ছোট ছোট বিষয়গুলো বা আয়াতগুলো আমাদের বা অনারবদের জন্য দুর্বোধ্য। অতঃপর হয়ত একারণে পথভ্রষ্টও। অনুরূপ একটি উদাহরণ পেশ করা হলো "আল্লাহপাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জবোধ করেন না। বস্তুত যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কি ছিল? এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না' (২ বাকারাহ -২৬)।

উপযুক্ত বিপথগামীদের সম্বন্ধেও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেছেন 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে ও তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে' (২২ হজ্জ-৩-৪)।

অপর এক স্থানে প্রত্যাদেশ এসেছে, শয়তানের আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা ওকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে ও যারা (আল্লাহর) শরীক করে' (১৬ নহল-১০০)।

এই হতভাগ্য পথভ্রষ্ট ও শিরেক স্থাপনকারীদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে, যার কোন সনদ নাযিল করা হয় নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' (২২ হজ্জ-৭১)।

পবিত্র মহাগ্রন্থের কোন কোন অংশে কিছু ছোট ছোট বিষয়বস্তুর উদাহরণ বা আলোচনা এসেছে, কিন্তু আসলে এগুলো যে মোটেও ছোট বা ক্ষুদ্র নয়। আলোচনা সাপেক্ষে তা প্রমাণ করা যাবে। মুশরিকদের দৌরাত্ম্য ও বাড়াবাড়ির ফলে মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যত একটি সামান্য চ্যালেঞ্জ (তাদের প্রতি) ছুড়ে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

'হে লোক সকল' একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর তারা কখন ও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনা কারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন' (২২ হজ্জ-৭৩)। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর দাবী বা আহবান একটি নিতান্তই সাধরণ ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু বিষয়টি কি আসলে সাধারণ, না অসাধারণ? এখানে তো কোন বড় বড় জীব-জানোয়ার বা উড়ন্ত পাখীর কথা বলা হয়নি, একটি সামান্য মাছি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহকে অবিশ্বাসকারীরা বা কাফেররা যে, সব দেব-দেবী, জিন বা অনান্য শক্তির পূজা করত তাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি মাছি সৃষ্টি করে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি আহবান জানান। আমরা জানি মাছি সুযোগ পেলেই মানুষের খাদ্য দ্রব্যে আঘাত হানে এবং সেখান হতে কিছু নিয়ে পালায়ন করে। এ খরবটা আল্লাহপাক জানেন। তাই বিদ্রোহী কাফের গোষ্ঠীকে তিনি বলেন, তোমাদের সমস্ত উপাসকের সর্বাত্মক চেষ্টায় একটি মাছি সৃষ্টি করে আন অথবা মাছি যে খাবারটুকু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তা উদ্ধার করে আন। কিন্তু কোনটি তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলে সে দেব-দেবী বা উপাসক দ্বারা তাদের কি উপকার হবে তা চিন্তাকরা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

বিষয়টি নিয়ে আরও কিছু আলোচনা দরকার। কারণ বর্তমান বিশ্ব এখন অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অবিষ্কারে ধাবমান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে কম্পিউটার, মোবাইলসহ যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। শত্রু নিধন ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যে অভাবনীয় মারণাস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে তাও ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক অস্ত্রভান্ডার যে কোন সময় কয়েক মুর্হূতে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। এরপরও ধ্বংস করার ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি অগণিত প্রাণীর সঙ্গে একটি প্রাণীর সংযোজন করার ক্ষমতা নেই এদের। এমনকি আলোচ্য ক্ষুদ্র একটি মশা-মাছি ও তৈরি করা সম্ভব নয়। এতে পৃথিবীর সমস্ত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক একত্রে চেষ্টা করুক অথবা শক্তিশালী পরাশক্তিগুলো যোগ দিক, কারো পক্ষে ওটা সম্ভব হবে না। অথচ মানুষ এ পরাজয় বা অপারগতা মেনে নিতে আগ্রহী নয় অর্থাৎ আল্লাহর একচ্ছত্র আধিকারে দ্বিধাবিভক্ত।

যাহোক মাতৃভাষার স্বচ্ছতার দিগন্তে ক্ষুদ্র বস্তুর বিপরীতে অভিযান চালালেও একই ধরনের Result বা ফলাফল বেরিয়ে আসবে। ক্ষুদ্র মশা ও মাছির ক্ষেত্রে মানুষের যেমন একটা অনাগ্রহ বা অবহেলা রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাও রয়েছে। উহার বিপরীত বৃহৎ ধনসম্পদ শালী, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি উন্নত পথে মানুষের আগ্রহ ও চেষ্টার কোন অন্ত নেই। কিন্তু এগুলোর দ্বারাও মানুষের আশা আকাঙ্খা কখন (অতীতে) পূরণ হয়নি। এখনও হচ্ছে না এবং আগামী দিনেও এ আশা কখন পুরণ হবার নয়। অতীতে বিপুল সম্পদের মালিকগণ তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের আগেই নানরূপ বিড়ম্বনার শিকার হয়ে পৃথিবী হতে চিরবিদায় নিয়েছেন। জ্ঞানী বিজ্ঞানীরাও তাঁদের আবিষ্কারের গবেষণা পূরণ করে যেতে পারেননি অর্থাৎ তাঁরা অনেক নব আবিষ্কার করলেও তাঁদের শেষ আশা টুকু পূরণ হওয়ার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। একইভাবে বিশ্ব জাহানের অসংখ্য ছোট-বড় দিগ্বিজয়ী আলেক জাণ্ডার, হিটলার, সুলতান মাহমুদ, নেপেলিয়ন বোনাপাটির মত বিশ্বজয়ের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। মাতৃভাষার আলোকে এসব ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাতৃভাষার দিগন্ত কে আরও সম্প্রসারিত করতে সহায়ক।

মাতৃভাষা বাংলার মান ও মর্যাদাকে উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই এদেশের শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ সাহিত্যিক, কবি, লেখক, দেশপ্রেমিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। এতদুদ্দেশ্যে **১৯৫৫** সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত

হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ শক্তিশালী ও সম্মানজনক ভাবে এগিয়ে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনায়। বর্তমানে বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদালাভ করায় সারা বিশ্বে প্রতি বছর **২১** শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। এই আসামান্য স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে **১৯৫২** সালের ভাষা শহীদদের অমর স্মৃতি বিশ্বের দরবারে চিরস্থরণীয় হয়ে থাকবে।

মোটকথা স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বাংলাভাষা শুধু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা লাভ করেছে, তা নয় বরং মাতৃভাষা হিসেবেই উহার সম্মান ও মর্যাদার অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। অবশ্য আলোচ্য রচনায় মাতৃভাষাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতেও প্রাপ্ত একটি পবিত্র দাবী আদায় হিসেবে গণ্য করে উহার স্বপক্ষে পবিত্র মহাগ্রন্থের সমর্থন পেশ করেছি। মাতৃভাষাই জ্ঞানের একমাত্র উৎসের সঠিক নির্বাচক ও নিশ্চয়তাদাতা মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ আরব বাসীর মাতৃভাষায় কুরবান অবতীর্ণ করেন। ইতোমধ্যে এবিষয়ে বেশ কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি।

এ প্রসঙ্গে আবরজাতির ইতিহাস উল্লেখযোগ্য, আরব ঐতিহাসিকদের মতে আরবী মুখের ভাষা হিসাবে বিস্তৃতি লাভ করার পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হিসেবেই প্রচলিত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা হতে তিল তিল করে রসদ সংগ্রহ করে আরব জাতি একটা উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। এই সভ্যতার বাহন ছিল আরবী ভাষা অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জ্ঞানের বাহন এবং উন্নয়নের ভাষা হিসাবেই মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা আরব জাতিকে তাদের মাতৃভাষায় কুরআন উপহার দিয়েছিলেন।

সুতরাং মাতৃভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন এর অভ্যন্তরস্থ অন্ততঃ সরল বাণীগুলো অনুসন্ধান করে আমাদের মাতৃভাষা আদায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্য আছে তা খুঁজে দেখলে অবশ্যই অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ও বার্তা পাওয়া যাবে। এতদসঙ্গে অনেক অবহেলিত প্রাণ ও অসচেতন আত্মা ও মন ফিরে পাবে তার ধর্মীর অবশ্য কর্তব্যের ন্যূনতম দায়িত্বগুলো।

মাতৃভাষা আল্লাহর দান

মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সরল-সহজ ভাষায় তাঁর নেতৃত্বের- কতৃত্বের, ক্ষমতার ও জ্ঞানের বর্ণনা দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছেন। অতঃপর তাঁর মহাজ্ঞানের বাণীকে (আল-কুরআনের বাণীকে) ভাষান্তরের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণও করেছেন সমগ্র বিশ্বময়।

বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের বিকেন্দ্রীয়করণ আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী নয়। তাই পবিত্র কুরআনকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে শুধু আরবীই আল্লাহর অনুমোদিত ভাষা নয়, অনান্য সকল ভাষাও আল্লাহর সৃষ্টি । আল্লাহ তা'আলা আরবী কুরআনের মাধ্যমে যে ভাবে আরবের জনগণ কে তাঁর পথে আনতে চান, বাংলায় কুরআন অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকেও একইভাবে আল্লাহ তাঁর পথে আনতে চান। অন্য ভাষাতেও একই পথ অনুসরণ করা হয়। সুতরাং পৃথিবীর সকল ভাষা বা মাতৃভাষা আল্লাহর দান। ভাষার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশ হলো করুনাময় আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাষা ,(৫৫ রহমান-১-৪)।

একই বিষয়ে জ্ঞান বিতরণের প্রয়াসে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে' (৩০ রুম ২০,২১,২২)।

'মানুষ ও মানুষের অসংখ্য ভাষার চেয়েও এক কঠিন সৃষ্টির বিষয় আল্লাহ জানালেন, মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো আরও কঠিন অবশ্য বেশীর ভাগ মানুষ এটা জানে না' (৪০ মুমিন-৫৭)।

'মহাক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বময় জ্ঞানের বাণীতে বলেন, "তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা,

সকল সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী তত্ত্বজ্ঞানী' (৫৯ হাশর-২৮)।

পৃথিবীর সকল ভাষা এক সর্বজ্ঞ আল্লাহর দান এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েও আত্মতৃপ্তির জন্য এবং পাঠকসমাজের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য আল্লাহর মহাসত্য বাণীগুলো উপস্থাপন করলাম। মানুষ সৃষ্টির পরই আল্লাহ তাকে ভাষা বা কথা বলা শিখিয়েছেন তা এক ও অভিন্ন নয়; বরং বৈচিত্র্যময়। অতঃপর ভাষা ও ভাষার অভিভাবক মানুষের চেয়েও কঠিন সৃষ্টির বিষয়টিও স্বয়ং আল্লাহ জানালেন সমগ্র মানব সম্প্রদাকে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি যে, সকল সৃষ্টি অপেক্ষা কঠিন, তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হলো। এ বিষয় তো আমরা মনে করতাম আসমান ও যমীন বিশাল কঠিন বস্তুর হলেও মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা কঠিন নয়। কারণ মানুষ সৃষ্টিতে অর্থাৎ মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি জ্ঞান-বুদ্ধি, সরলতা-কুটিলতা, জটিলতা, প্রভৃতির যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তা বর্ণনা করা তো দূরের কথা, চিন্তা করাও অসম্ভব। তবুও এ মানুষ সৃষ্টিকেই আল্লাহ সহজ বলেছেন, আসমান-যমীন সৃষ্টির তুলনায়। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের চিন্তার এক নতুন দিগন্ত।

এ অত্যাশ্চর্য তথ্য ছাড়াও আরও অনেক কঠিন কঠিন বিষয় বেরিয়ে আসবে এ পবিত্র মহাগ্রন্থের বিশাল কলেরর হতে। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আয়াতগুলোর অনুসন্ধানে সৃষ্টির সূচনা পর্বের একটি বিস্ময়কর আয়াত তুলে ধরলাম। এতে কুরআনের ধারক মহানবী (সাঃ)- কে বলা হয়েছে, 'বলুন তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও সেখানে কল্যাণ রেখেছেন। আর চারদিনের মধ্যে সেখানে মাত্রা অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন সমানভাবে সকলের জন্য, যারা এর সন্ধান করে। তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দিলেন আর, তা ছিল ধোঁয়ার মতো। তারপর তিনি তাকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা কি দুজনে স্বেচ্ছায় আসবে না অনিচ্ছায়? তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় এলাম। তারপর তিনি আকাশকে দুদিনে সাত আকাশে পরিণত করলেন, আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন। আর তিনি নিচের আকাশকে সাজালেন প্রদীপ দিয়ে এবং সুরক্ষিত করলেন। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যাবস্থাপনা' (৪১ হামীম সাজদাহ ৯- ১২)।

উপরোক্ত আয়াতের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে মহাজ্ঞানবান ও মহাক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশ ও

পৃথিবীর পরিকল্পিত নকশা সুস্থির করে আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে একসঙ্গে বললেন, তোমরা দু জনে স্বেচ্ছায় আসবে না অনিচ্ছায় আসবে, তা বলো। তারা উভয় বললো, আমরা স্বেচ্ছায় এলাম। এখানে মহান আল্লাহর জিজ্ঞাসা এবং আকাশ ও পৃথিবীর উত্তর উভয়ের মধ্যে একটা তাৎপর্য নিহিত আছে। তা হলো আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানের ও মহাশক্তির ইচ্ছায় তৈরি নক্সা আকাশ ও পৃথিবীকে বাস্তবরূপ নিয়ে আসতেই হবে বা আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করবেনই। কাজেই তাদেরকে স্বেচ্ছায় আসলেও আসতে হবে, অনিচ্ছায় আসলেও আসতে হবে। ওদিকে আকাশ ও পৃথিবীও সঠিকভাবেই জানে যে, তারা স্বেচ্ছায় বা অপোসে নিজ নিজরূপ নিয়ে হাজির না হলে আল্লাহ তাঁর মহাশক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ দ্বারাই তাদেরকে বশীভূত করে বা বাধ্য করে হাজির করবেন। তাই তারা আল্লাহর কোন প্রকার অসন্তোষ সৃষ্টি না করেই তাঁর আহ্বান বা হুকুম মাত্র উপস্থিত হয়ে যায়।

এখানে আমাদের কাছে কৌতুহল হলো, আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন। আকাশ ও পৃথিবী হলো জড় বস্তু, এরা তো কথা বলে না বা এদের ভাষা নেই। কিন্তু এ মহাগ্রন্থের মহাসত্য বাণীর তো বিকল্প নেই, কাজেই আকাশ ও পৃথিবীর কথা বলা সঠিক ও সত্যবাণী। জড়বস্তু যে কথা বলে তার আরও প্রমাণ আছে অথাৎ জড়বস্তুর কথাবলা পবিত্র কুরআনেই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া সবচাইতে বড় কথা হলো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও অসীম জ্ঞানবান,তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছ নেই। আমরা যদি তাঁর মহিমার জ্ঞানের জগতে অপলক নেত্রে চেয়ে দেখি তবে তাঁর দেওয়া মাতৃভাষার প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হবো, মায়ের চেয়েও ভালবাসবো মাতৃভাষাকে এবং মাতৃভাষার উদ্ভাবক আল্লাতা'আলাকে।

ছাত্রজীবনে আমার প্রিয় সাবজেক্ট ছিল যুক্তিবিদ্য (Logic)। সেখানে পড়েছি, কারণ ছাড়া কোন কাজ হয় না, বা কোন কিছু ঘটেনা, বা কোন কিছু সৃষ্টিও হয় না। সে কোন বস্তুর সৃষ্টির অন্তরালে একটা উদ্দেশ্য বা কারণ থাকে। আল্লাহর এবিশাল দুনিয়ার সৃষ্টির বৃহৎ হতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম শত কোটি বস্তুর পৃথক পৃথক সৃষ্টির পৃথক পৃথক কারণ আছে। এর সমুদ্য় কারণ একমাত্র তিনিই জানেন, যেহেতু তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা।

আমরা মানব জাতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর বুকে বহু অবদান সৃষ্টি রয়েছে আমাদের জন্যে। কিন্তু বিনা কারণে বা প্রয়োজনে কোনটিই সৃষ্টি করা হয়নি। আমরা ব্যক্তিগত জীবনেও বিনা কারণে বা প্রয়োজনে একটি কাজ ও করিনা। আর যা করি তা আমাদের বিবেক বা মনের ভাষা সুস্পষ্ট ভাবেই জানে এবং যা

করা হয় সেও জানে কেন তাকে (ব্যবহার) করা হয়। সুতরাং এ পার্থিব জগতেও দৃশ্য অদৃশ্য সকল (ভাল ও মন্দ) বস্তুরই ভাষা আছে, সেগুলোর কিয়দাংশ আমরা সরাসরি জানি, কিয়দাংশ কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানি, আর কিয়দাংশের কিছুই জানি না। এখানে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান গর্ভের তাৎপর্যপূর্ণ সরবরাহ গুলো আলোচনা করব। একটু আগেই বলেছি, আকাশ ও পৃথিবীর মত অনান্য জড়বস্তুগুলোর ভাষা আছে। এরূপ প্রশ্ন ও প্রসঙ্গে আমাদের মহানবী (সাঃ) যখন বিব্রত বোধ করতেন, তখন এ জ্ঞান গর্ভের রহস্য জনক আয়ত গুলো অবতীর্ণ হতো। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ) কে লক্ষ্য করে প্রত্যাদেশ করেন যে, 'তারা যাবলে তাতে আপনি সবর করুণ এবং আমার শক্তি শালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন শীল। আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। আর পক্ষীকুলকেও যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আমি তাঁর সাম্রাজকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা' (৩৮ ছোয়াদ ১৭-২০)।

একই বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল তোমরাও। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম' (৩৪ সাবা ১০)।

এ বিষয়ে গভীর আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসে মহাজ্ঞানী আল্লাহ আরও বলেন, 'আপনি কি দেখেন না যে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকূল তাদের পাখা বিস্তার করত আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত' (২৪ নুর-৪১)।

নভোমন্ডল ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণায় অর্থ, আল্লাহতা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, সূর্য, গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, জন্তু, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস, সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপত আছে, বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক করে না। তাদের এই আনুগত্যকেই তাদের ইবাদত, পবিত্রতা মহিমা ঘোষনা বলা হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এমন বোধশক্তি ও চেতনা

নিহিত রেখেছেন, যদ্বরা সে তার স্রষ্টাকে স্মরণ করতে পারে এবং দোআ করতে পারে। আল্লাহ্‌র অসীম সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যময় প্রতিযোগিতায় উপরে উদ্ধৃত আয়াত কয়টিতে পাহাড় পর্বত ও পক্ষীকূলের তসবীহ্ পাঠ করার এক রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। এ তসবীহর ভাষা নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রদত্ত ভাষা এবং তাঁর সন্তুষ্টির ভাষা। এরূপ কত অগনিত ও অবর্নণীয় আশ্চর্য্যতম ভাষা তাঁর মহাভান্ডারে ও নভোমন্ডল ভূমন্ডলে দৃশ্যে ও অদৃশ্যে বিরাজ করছে তার কোন ইয়ত্তানেই হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর রহমতে অলৌকিকভাবে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ)- কেও মহা রহস্যবিদ আল্লাহ তা'আলা বিশাল রাজত্ব দিগ্বিজয়ী শক্তি ও বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা ভূষিত করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর জ্ঞান ও শক্তির বিষয়টি পবিত্র কুরআনে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাহলো, "সুলাইমান ছিল দাউদের উত্তরাধিকারী ও সে বলেছিল, হে মানুষ! আমাকে পাখিদের ভাষা বোঝাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবই দেওয়া হয়েছে, এতো স্পষ্ট অনুগ্রহ।

সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও পাখিদের সমবেত করা হলো এবং ওদের বিভিন্ন ব্যুহে বিন্যস্ত করা হলো। যখন ওরা পিঁপড়েদের উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপঁড়ে বলল, পিঁপড়ারা! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢোক, না হলে সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী তোমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে আর তারা টেরও পাবে না।

"সুলাইমান ওর কথায় মুচকি হাসল ও বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার উপর ও আমার পিতামাতার উপর আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য, আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শামিল করুন।"

সোলায়মান পাখিদের ভাল করে দেখলো ও বলল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? সেকি উধাও হয়েছে? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি তো তাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা মেরে ফেলব।

সে (হুদহুদ) দেরী না করে এসে পড়ল ও বলল, আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই। আর সাবা থেকে সঠিক খবর এনেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম সে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবই দেওয়া হয়েছে ও তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার

সম্প্রাদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকর্ম শোভন করেছে ও ওদের সৎপথ থেকে দূরে রেখেছে, যেন ওরা সৎকর্ম না পায় এবং যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর সেই আল্লাহকে যেন ওরা সিজদা না করে। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনিই মহাআরশের অধিপতি।

সুলাইমান বলল, "আমি দেখব তুমি সত্য বলছ না মিথ্যা বলছ? তুমি আমার এ চিঠি নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে দিয়ে এসো। তারপর তাদের কাছে থেকে সরে পড় ও দেখ তারা কী উত্তর দেয়।'

সাবার রাণী বিলকিস বলল, "হে পরিষদবর্গ আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে,এটা সুলায়মানের কাছ থেকে। আর তা এই, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। অহংকার করে আমাকে অমান্য করো না। আর আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।

বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের পরামর্শ দাও আমি যা করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি।

ওরা বলল, "আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আপনার, কী নির্দেশ দেবেন তা আপনিই দেখুন।" বিলকিস বলল রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন ওকে বিপর্যস্ত করে দেয় ও সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্ত করে, এরাও তাই করবে। আমি তার কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি দেখি দূতেরা কী উত্তর আনে।

দূত সোলায়মানের কাছে এলে সুলায়মান বলল, তোমরা কি আমাকে ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়েছেন আমাকে, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ। তোমরা ওদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হব যা রুখবার শক্তি ওদের নেই। আমি ওদের সেখান থেকে অপমান করে বের করে দেব ও ওদেরকে দলিত করব।

সুলায়মান আরও বলল, 'হে আমার পরিষদবর্গ তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? '

এক শক্তিশালী জিন বলল, "আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই তা এনে দেব। এ ব্যাপারে আমি এমন শক্তি রাখি। আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, 'আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দেব।

সুলায়মান যখন তা সামনে রাখা দেখল, তখন সে বলল, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের জন্য করে। আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক যে আমার প্রতিপালকের অভাব নেই তিনি মহানুভব।

সুলায়মান বলল, 'তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে ঠিক ধরতে পারে না সে ভুল করে? বিলকিস যখন পৌঁছল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এ রকম?

সে বলল, 'এতো এরকমই। আমরা আগেই সবকিছু জেনেছি আত্মসর্মপণ ও করেছি, আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল, সে (বিলকিস) ছিল অবিশ্বাসী সম্প্রাদয়ের একজন।'

তাকে বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটার দিকে তাকাল তখন তার মনে হলো এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় হাটু পর্যন্ত টেনে তুলল। সুলায়মান বলল, এ তো স্বাচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদ।

বিলকিস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো নিজের উপর যুলুম করেছিলাম। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করছি' (২৭ নামল ১৫-৪৪)।

সাধারণ অর্থে ভাষা বলতে আমরা যা বুঝি তা বিশ্বজগতের অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ধরনের ভাষাকেই বুঝায়। এই অসংখ্য ভাষার পৃথক পৃথক বর্ণ শব্দ, বাক্য প্রভৃতির একটি অপরটির সঙ্গে কোন মিল নেই। কিন্তু অর্থের দিক থেকে প্রায় সকল সভ্য ও সামাজিক ভাষার সারমর্ম এক ও অভিন্ন বলে আশা করা যায়। প্রাণী জগতের অসংখ্য ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য নিয়ে ইতোমধ্যে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। জড়জগতেও অন্তর্নিহিত ভাবে জড়দের পৃথক পৃথক ভাষা আছে।

পবিত্র কুরআনে জড়দের ভাষা সর্ম্পকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন উপরে বর্ণিত (পাহাড় পর্বতের তাসবীহ পাঠ) কাহিনীর বাস্তবতা।

প্রাণী জগতের সকল প্রাণীই আলাদা আলাদাভাবে তাদের নিজ নিজ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় হলো মানুষতো পশু-পাখি,

কীট-পতঙ্গের ভাষা বোঝে না, অথচ তারা কিভাবে মানুষের কথা বুঝাল? হযরত দাউদ (আঃ) -কে ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা সকল পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের ভাষা বোঝার শক্তি দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা হুদহুদ পাখির ও পিঁপিলীকার সতর্কবাণী সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু উপরের আলোচনায় দেখাযায় হুদহুদ পাখিও সুলায়মান (আঃ)- এর অসন্তুষ্টির কথা বা গতি প্রকৃতি বুঝে তাঁকে এক নব আবিষ্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। সত্য ঐ কাহিনী ঐতিহাসিকভাবে পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত আছে। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর ইচ্ছায় এরূপ অলৌকিক ঘটনার বহু নিদর্শন পবিত্র কুরআন ও হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে।

এ দুনিয়ায় এমন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দৃশ্য বা অদৃশ্য বস্তু আছে যা ভাষা বা মাতৃভাষার মতই মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যেমন আলো-আঁধার, তাপ- ও ঠান্ডা, বায়ু, পানি, শব্দ প্রভূতি বস্তুগুলি ভাষার ন্যায়ই দিগন্ত প্রসারী এবং এবস্তুগুলো সমস্তই উহাদের স্রষ্টা এক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এগুলো প্রধানত মানবজাতির কল্যাণে ও প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছে, মানুষের জীবন যাপন ও প্রাণরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক জগতের এসব মূল্যবান বস্তু একটি অপরটির পরিপুরক। এগুলোর যে কোন একটিকে বাদ দিলে মানব জীবন অচল হয়ে যাবে।

আমাদের আলোচিত ভাষা বা মাতৃভাষাও আলো-অন্ধকার, তাপ, বায়ু, পানি, ইত্যাদির মতই একটি মহাব্যাপক উপাদন। পৃথিবীর সামাজিক জীবন যাপনের প্রাথমিক স্তর হতে ক্রমোন্নত হয়ে দেশ-বিদেশ ও আন্তর্জাতিক মহলে ভাব ভাষা হতে মতৈক্যের ভিক্তিতে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে মানবতার পক্ষে একটা বড় সুসংবাদ। পক্ষান্তরে একই ভাব ভাষায় ঈষৎ পরিবর্তিত রূপের কারণে সৃষ্ট মতভিন্নতা হতে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে ও হচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে অমানবিক যুদ্ধ-বিগ্রহ, হামলা, সন্ত্রাস, আত্মঘাতী, বোমাহামলা, নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধার্মিকের উপর অন্যায়, অত্যাচার, যুলুম নির্যাতনের ধারাবাহিক ইতিহাস।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মহাপরিচালক মানবজাতির সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করছেন। অতঃপর একদিন এর সমাপ্তি ঘটিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন এবং কিছু সময় পর পুনরায় সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করবেন এবং কেবলমাত্র মানব জাতির বিচার করবেন। পৃথিবীর শেষ পর্বের সেই শেষ দিনের নামই কিয়ামত দিবস বা বিচার দিবস।

এই দিবসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমরা অনেক বিজ্ঞ আলেম সম্প্রদায়ের কাছে শুনেছি এবং কুরআন হাদীসে দেখেছি।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে পৃথিবীতে কোন জটিলতা নেই বা কোন অসাধ্যজনক আদেশ-নির্দেশও নেই। কিন্তু মানুষের প্রতিপক্ষ বা শত্রু হিসেবে সৃষ্ট শয়তান ইবলীসের চক্রান্তে অনেক জটিল অধ্যায়ের উপস্থিতি ঘটেছে। এই জটিলতা হতে আত্মরক্ষার জন্যেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির মাতৃভাষায় তাদের জন্য তাঁর অমূল্য আদেশ-নির্দেশ এবং জন্ম-মৃত্যুসহ পৃথিবীর বাস্তব ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক হুবহু ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। মাতৃভাষার বোধগম্য অত্যন্ত সহজ এক প্রত্যাদেশে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণ, শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার' (১৬ নাহল ৭৮)।

আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা বিদেশী ভাষার মধ্যে আরবীকেই কঠিন ভাষা বলে মনে করি। কিন্তু আরবী সাহিত্যের উৎস পবিত্র কুরআনের ভাষায় জাটিলতা খুবই সামান্য। আলোচ্য রচনায় পবিত্র কুরআনের সহজ সম্প্রাচার পর্যবেক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে অনেক বঙ্গানুবাদের উদাহরণ বা উপদেশ প্রয়োজন মত উপস্থাপন করেছি। মাতৃভাষা, মায়ের ভাষা, অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করা, নিঃসংশয় চিত্তে ভালবাসার ভাষা, সচেতনভাবে কাজ করার ভাষা, অভিজ্ঞতা অর্জনের ভাষা, সত্য ন্যায় ও মহত্ত্বকে চেনার ভাষা আবার হঠাৎ নিজের অজান্তেই প্রতারকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসেরও ভাষা। বাংলা ভাষায় বা পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় মহৎপ্রাণ লেখকদের রচনাবলীতে মানুষ সম্পর্কে এমনই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বিষয়ের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষিত আছে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজান্ডার যখন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন নিয়ে বাহির হন তখন তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী অপরাজিতভাবে একের পর এক দেশ জয় করে নিজেদের অভিযানকে সফল করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এসময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত তক্ষশীলা নামক একটি ছোট রাজ্যের রাজা পুরু তাঁর ছোট্ট সেনাবাহিনী নিয়ে অত্যন্ত বীর বিক্রমে আলেকজান্ডারে সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু আলেকজান্ডারের বিশাল সেনাবাহিনীর নিকট রাজা পুরু পরাজিত ও বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় রাজা পুরুকে সম্রাট আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি এখন আমার নিকট হতে কিরূপ

ব্যবহার প্রত্যাশা করেন? পুরু তাঁর মাতৃভাষায় সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাজার প্রতি রাজার যেরূপ ব্যাবহার হওয়া উচিত ঠিক তদ্রুপ। পুরুর এই উত্তরে সম্রাট আলেকজান্ডারের পবিত্র মাতৃজ্ঞান সততায় আলোকিত ও বিগলিত হয়ে রাজা পুরুকে তাঁর রাজা ফিরিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সম্রাট আলেকজান্ডার ও রাজা পুরুর এই ঐতিহ্য মণ্ডিত ঐতিহাসিক কাহিনী কোন দিন ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর ইতিহাস হতে মুছে যাবার নয়। মাতা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এই সম্মান ও মর্যাদা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্ক লেপনের অধ্যায় সংযোজনের হোতা রবার্ট ক্লাইভ, মীরজাফর, ঘষেটি বেগম, রাজবল্লভ, ইয়ার লতিফ এর দল কিভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে তাঁর মহত্ত্ব ও বিশ্বস্ততাকে মানবতা বিবর্জিত ষড়যন্ত্রের দ্বারা পদদলিত করে মানবচরিত্রের জঘন্যতম ও হীনতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মাত্র আড়াই শো বছর আগে আমাদের এই মাতৃভূরিই এই ইতিহাস বিশ্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মাতা, মাতৃভূতি ও মাতৃভাষার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা ও অবমাননা বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বস্তুতঃ মাতৃভাষা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগণের সমানাধিকারের ভাষা। বড় বড় জ্ঞানী-বিজ্ঞানী নবী-রাসুল, ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মযাজক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি, লেখক, গায়ক, শিল্পী কেহই মাতৃভাষা ছাড়া তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। মাতৃভাষার ছত্রছায়ায় তাঁরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও গবেষণার বিষয় সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর সেখানে হতে বা সে ভাষা হতে ভাষান্তরের মাধ্যমে উক্ত বিষয় আয়ত্ত্ব করেন। যারা সমাজে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পরিবারে বসবাস করে, মাতৃভাষা তাদের প্রধান সম্বল এতদ্ব্যতীত গরীব-দুঃখী, ফকির-মিসকীন, অন্ধ-খঞ্জ, এতিম, বধির-বোবা, পাগল, আধাপাগল, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি অসহায়দের জন্য মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থানের চেয়েও এরা মাতৃভাষার উপর অধিক নির্ভরশীল।

জ্ঞানশক্তি উৎপাদনের জন্যই মাতৃভাষার জন্ম

আমাদের জ্ঞানসীমার অন্তর্বর্তী কতিপয় আর্শ্চযতম, গুরুত্বপূর্ণ কল্পনীয় ও অকল্পনীয় দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর সমন্বয়ে এ আড়ম্বরপূর্ণ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বৈচিত্র্যহীন জগতের অভিযান শুরু হয়েছে। দৃশ্য বস্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্যতম হলো উর্ধ্ব জগতে স্থাপিত আসমান সমূহ ও তদসংলগ্ন ছায়াপথে লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মিলন মেলা। অতঃপর যমীনের বুকে স্থাপিত বিশাল বিশাল সাগর-মহাসাগর সমূহ, পাহাড়-পর্বত, অগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, নদ-নদী, হ্রদ, মরুভূমি, মরুদ্যান বন-জঙ্গল, সমভূমি, মালভূমি, গিরিপথ প্রভৃতি। অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে শব্দ, বায়ু, আলো, অন্ধকার, তাপ, ঠান্ডা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সত্য-মিথ্যা, সততা, প্রতারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিশ্বাসভাজন, বিশ্বসঘাতক, ভালবাসা-শত্রুতা, সম্মান-অসম্মান, ঘৃণা-শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম–বিশ্বাস, নাস্তিকতা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত রয়েছে জন্ম-মৃত্যুর খেলা ও প্রাণী জগতের উপর স্রষ্টার ভীতি প্রদশনকারী নমুনা ভূমিকম্প, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হ্যারিকেন, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, দাবানল এবং আরও কত জানা-অজানা ভয়ংকর দৃশ্য, দুর্যোগ সুবিধা ও অসুবিধা।

উপরে বর্ণিত এ জগতে মানুষ একটি সামান্য প্রাণী মাত্র। কিন্তু বিধাতার দেওয়া জ্ঞান শক্তি হতেই সে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বংশানুক্রমে রাজত্ব করে আসছে। মানুষ তার এই শ্রেষ্ঠত্বে গর্বিত, আনন্দিত, ধন্য, কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ বহুধারায় বিভক্ত। মানুষ তার কৃত ভুলের জন্যে লজ্জিত, দুঃখিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রাণী হয়েছে তার স্রষ্টার কাছে। পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট দাসকে (মানুষকে) ক্ষমাও করে দিয়েছেন। অতঃপর তার (মানুষের) প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু শয়তানের মিথ্যাচার ও প্রতারণার কবল হতে মুক্ত থাকার আহবান জানিয়েছেন বার বার। এতদসত্ত্বেও মানব জাতি প্রায়ই শয়তানের চক্রান্তে বহুবার ভুল করেছে বা করে আসছে। যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে, সঠিক পথও পেয়েছে। কিন্তু অনেকেই শয়তানের শক্তিশালী প্রচেষ্টায় ও প্রতিরোধে নিজেদের ভুলকে ভুল স্বীকার না করে ভুলকে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং সক্ষমও হয়েছে অনেকে। মানুষ নিজের ভুলকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করতে যে শক্তি প্রয়োগ করে বা কৌশল অবলম্বন করে তা তার ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা শয়তানের দ্বারা পরিপক্ক হয়েছে। তবে সে জ্ঞানের উৎসও তার মাতৃভাষা।

কারণ মাতৃভাষায়ই সে ঐ অর্জন করেছে, ফলে সে মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। আর যে সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় তারা যে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সমুদ্রের গভীরে চলে যায়, যেখানে শয়তানী প্রতিকূল শক্তি কোন পাত্তা পায় না। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা করে তারা মাতৃভাষায় প্রাপ্ত জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে না, ফলে শয়তান খুব সহজেই এই হতভাগ্যকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত পথে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার -অবিচার,অমানবিক প্রভৃতি বিষয়গুলো এক নয়, বরং একটি অপরটির বিপরীত। এগুলোর মধ্যে অনুকূল ধর্মী সত্য, সঠিক, ন্যায় ও মানবিক বিষয়গুলো পৃথিবীতে শান্তির পথ নির্দেশক। পক্ষান্তরে প্রতিকূল ধর্মী মিথ্যা, অন্যায়, অমানবিক, বিষয়গুলো পৃথিবীর জন্য অশান্তির চাবিকাঠি। কিন্তু পৃথিবীর জীবন যাপনে এই মৌল বিষয়গুলো এক সঙ্গে সৃষ্টি হওয়ার এবং একত্রে (পাশাপাশি) অবস্থান করায় উভয়ে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে সত্যের দাবীদারকে স্থানচ্যূত করে মিথ্যার স্থানে নিক্ষেপ করতে এবং মিথ্যার মালিককে কৌশল অবলম্বন করে সত্যের মালিক বানানোর চেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক কালের উদ্ভাবিত চাতুর্য।

এ পৃথিবীতে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব আবহমানকালের। সত্য-মিথ্যা নিয়ে মতভিন্নতা, তর্ক-বির্তক, বাদ-প্রতিবাদ, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনাখুনি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ- বিগ্রহ ও হয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে। এখনও তার জের অব্যাহত আছে। এ সামাজিক ব্যবস্থাও প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে। এখানে প্রাচীনকালের একটি ঐতিহাসিক শপথ কাহিনী, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো,

"ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলী যুগে সর্বপ্রথম শপথ, গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আমাদের বানী হাশেম গোত্রের মধ্যে। বিস্তারিত ঘটনা এই যে, একদা কুরাইশ গোত্রের কোন এক শাখার জনৈক ব্যক্তি বানী হাশিম গোত্রের একটা লোককে মযুর নিযুক্ত করেছিল। তারপর সে (মজুর) তার সাথে তার উটগুলোকে নিয়ে যাত্রা করল। ঘটনাক্রমে বানী হাশেম গোত্রের অপর একজন লোক তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল,যার খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তার বন্ধনটা ছিড়ে গিয়েছিল। লোকটি তখন (হাশেমী মযুরকে) বলল, আমাকে একটা রশি দিয়ে সাহায্য কর, যা দিয়ে আমি আমার বস্তার মুখটা বাঁধতে পারি। আর যাতে আমার উটটাও পালিয়ে যেতে না পারে। তখন সে

তাকে একটা রশি দিল। লোকটি তার বস্তার মুখ ঐ রশি দ্বারা বেঁধে নিল এবং চলে গেল। এদিকে তারা যখন এক জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলল, তখন একটা উট ব্যতীত সবগুলো উট বাঁধা হলো। কুরাইশ গোত্রের যে লোকটা তাকে মযুর নিযুক্ত করেছিল, সে তখন বলল, কি ব্যাপার!

অন্যান্য উটের ন্যায় এ উটটাকে যে বাঁধা হলো না? সে (মযুর) জবাব দিল, এর রশি নেই। লোকটা জিজ্ঞেস করল, এর রশি কোথায় গেল? বণী হাশিম গোত্রের মযুরটা তখন সম্পুর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে তার ভারী রাগ হলো। ইবনে আব্বাস বলেন, কুরাইশ বংশের লোকটা তখন হাশেমী মযুরটাকে লাঠি দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করল যে এ আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। সে যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল তখন একজন ইয়েমেনবাসী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে আহত মযুর তাকে বলল, তুমি কি হজ্জের মওসুম উপলক্ষে মক্কায় যাবে? সে বলল, না যাব না, তবে অন্য যে কোন সময় সেখানে যেতে পারি। হাশেমী লোকটা বলল, যে কোন সময় হোক, তুমি কি আমার একটা সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে? সে বলল, হ্যা পারবো। হাশেমী লোকটা বলল, যদি তুমি হজ্জ মওসুমে মক্কা যাও, তবে সেখানে গিয়ে প্রথমে এই বলে ডাক দেবে, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা। যখন তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে, তখন তুমি (পুনরায়) এ বলে ডাক দেবে, হে বণী হাশেম গোত্রের লোকেরা। যদি তারাও তোমার ডাাকে সাড়া দেয় তবে আবু তালেবের খোঁজ নিয়ে তাকে এখবরটা দেবে যে, অমুক কুরেশী ব্যক্তি আমাকে (মাত্র) একটা রশির জন্য হত্যা করেছে। এবলে হাশেমী মযুরটা প্রাণ ত্যাগ করল। অতঃপর কুরাইশ গোত্রের যে লোকটা তাকে মযুর নিযুক্ত করেছিল সে যখন মক্কায় ফিরে এল তখন আবু তালিব তার নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের লোকটার কি হল? সে বলল, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তার সেবা-শুশ্রুষা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশেষে সে মারা গেলে আমি তার দাফন কাফন সম্পন্ন করে এসেছি। তিনি (আবু তালিব) বললেন, তোমার কাছ থেকে এমনটাই আশা ছিল। এরপর কিছু দিন কেটে গেল। ঐ লোকটা যাকে উক্ত হাশেমী সংবাদ পৌঁছাবার অছিয়ত করেছিল হজ্জের, মওসুমে মক্কায় আসল এবং ডাক দিয়ে বলল, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা। লোকেরা (কুরাইশ গোত্রের প্রতি ইংগিত করে) বলল, কুরাইশ হলো এরা। তারপর সে বলল, হে বনী হাশেমী। লোকেরা বলল বনী হাশেম হলো এরা। সে বলল, আবু তালিব

কোথায়? লোকেরা (তাকে দেখিয়ে) বলল, ইনিই হলেন আবু তালিব। সে (তখন) বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তি বলেছে আপনার নিকট এ খরবটা পৌঁছে দেয়ার জন্য যে অমুক লোকটা মাত্র একটা রশির জন্য তাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবু তালিব ঐ হত্যাকরীর নিকট গেল এবং তাকে বলল, আমাদের প্রস্তাবিত তিনটের যে কোন একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। হয়ত তুমি (খুনের বিনিময় স্বরূপ) একশো উট দিবে। কেননা তুমি আমাদের লোককে হত্যা করেছে। নচেৎ তোমার গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করোনি। যদি এর কোনটাই তুমি করতে অস্বীকার কর, তবে তার (হত্যার) বদলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটি তার স্বগোত্রীয়দের নিকট গেল। তারা বলল, আমরা হলফ করব। এ সময় বানী হাশীম গোত্রের জনৈকা মহিলা আবু তালিবের নিকট আসল। উক্ত মহিলা ছিল তাদের অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির পত্নী ঐ মহিলার একটি সন্তান ছিল। সে বলল, হে আবু তালিব! আমি চাই যে, পঞ্চাশজনের মধ্য থেকে তুমি আমার সন্তানটাকে রেহাই দেবে এবং যেখানে হলফ নেয়া হয় (অর্থাৎ রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থল) সেখানে তার হলফ নেবে না। তিনি (আবু তালিব) তাই করলেন। অর্থাৎ মহিলার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তারপর তাদের মধ্যে থেকে আরেকজন লোক তার নিকট আসলো এবং বলল, হে আবু তালিব! তুমি একশো উটের স্থলে পঞ্চশ জন লোকের হলফ নিতে চাচ্ছ, এ হিসেবে প্রতিটি লোকের ভাগে দুটি করে উট পড়েছে। সুতরাং এ উট দুটো আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং যে জায়গাটিতে হলফ নেয়া হয় সেখানে আমার কাছ থেকে হলফ নিত্ত না। আবু তালিব (তার কাছ থেকে উট দুটো গ্রহণ করলেন এবং (অবশিষ্ট) আটচল্লিশ ব্যক্তি এসে হলফ করলো। ইবনে আব্বাস বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ একটা বছর না যেতেই ঐ আটচল্লিশ জন লোকের একটা লোকও আর বেঁচে রইলো না (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীসটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাণীয় বিষয় আছে। প্রথমত হাশেমী ময়ুরটি তার উট নিয়ে যাত্রার (কর্ম) পথে তার স্বগোত্রীয় লোকটিকে বস্তার বন্ধনের একটি রশি দিয়ে উপকার করল এতে তার স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পেল। কিন্তু রশিটা যেহেতু মালিকের, কাজেই তাকে বলে (রশিটা) দেওয়া উচিত ছিল। এটা হাশেমী ময়ূরের একটা বড় ভুল। পক্ষান্ত রে এই ভুলের জন্য তার মালিকের উত্তেজিত হওয়াটা আরও বড় বেশী ভুলে

রূপান্তরিত হয়। এরপরও ঐ ময়ূরের মৃত্যুর পর বিষয়টি সত্যপথে মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের মালিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় হাশেমী ময়ুরের মৃত্যুকালীন আছিয়ত বহনকারী ইয়েমেনী ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মক্কায় সংবাদটি উপস্থাপন করে। এতে কুরাইশী মালিক হাশেমী সর্দার আবু তালিবের বিচারের সম্মুখীন হয় এবং এখানেও মিথ্যার পথই বেছে নেয়। কুরাইশ (খুনী) মালিক তার অর্থের প্রভাবেই হোক বা বংশীয় জনবলের জোরেই হোক সে তার গোত্রের পঞ্চাশ জনকেই মিথ্যা শপথ গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল।

এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে দুজন আন্তরিক ভীতি নিয়ে (সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য) হাশেমী সর্দার আবু তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অনুমতিক্রমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে মুক্তি নেয়। অবশিষ্ট আটচল্লিশ জন মিথ্যা শপথ গ্রহণ করে। অথচ তারাও ইচ্ছা করলে মুক্তিপ্রাপ্ত দু'জনের ন্যায় প্রত্যেকে দু'টি করে উট দিয়ে খুনের মত মিথ্যার কবল হতে মুক্ত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত খুনী ব্যক্তি নিজেও তার গোত্রের লোকদের কাছে সত্য কথা বলে একশত উট দিয়ে সম্মানজনক মীমাংসা করে নিতে পারত। কিন্তু তার শয়তানী মদদ তাকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল ফলে সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে এবং তার গোত্রের আটচল্লিশজন লোককেও ধ্বংস করেছে। অপরদিকে সত্যের বিজয় হিসেবে দু'জন রক্ষা পেয়েছে আল্লাহর রহমতে।

দেড় হাজার বছর পূর্বের জাহেলী যুগের বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে বর্তমান সভ্য যুগের ঘটনা প্রবাহেও যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। আসলে মানব চরিত্রে একটা ধারাবাহিক সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য আছে।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার অসীমজ্ঞানে সৃষ্ট কোন বস্তুরই পুর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করা কোন মুনষের পক্ষে সম্ভব নয়। তন্মধ্যে অদৃশ্য বিষয়ের আলোচনা করা আরো কঠিন। আমাদের জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য বায়ুর সৃষ্টি রহস্য, উহার মত্তজুদ ভাণ্ডার, উহার কাজের পরিসর, সমগ্র বিশ্বে বন্টন পদ্ধতি, বন্টন পদ্ধতিতে হ্রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ কোথাও কম কোথাও মাঝারী, কোথাও প্রচণ্ড ঝড়, ঘুর্ণিঝড়, টর্নোডো, হ্যারিকেন প্রভৃতি কত প্রলয়ংকরী আকার ধারণ করে। অথচ বায়ুও মাতৃভাষর ন্যায় সর্বদা আমাদের দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আছে।

মাতৃভাষাও বায়ুর ন্যায় শব্দ ও আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টতম সম্পর্কের একটি অত্যবশ্যকীয় অদৃশ্যশক্তি। বায়ুর বিশাল মওজুদ ভাণ্ডার সম্পর্কে আমরা যেমন অজ্ঞ, অথচ উহার মওজুদ ভাণ্ডার সুনিশ্চিত। তদ্রূপ অদৃশ্য শক্তি শব্দের ও এক মহাভাণ্ডার আছে যা উহার স্রষ্টাই একমাত্র জানেন। বায়ু ও মাতৃভাষার ন্যায় শব্দও আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। শব্দ ব্যতীত একটি মুহূর্তও আমাদের অতিবাহিত হয় না। শব্দ কোথা হতে আসে, কেন আসে, কিভাবে আসে, কত পরিমাণ আসে, একই সঙ্গে কত প্রকারের শব্দ উল্লিখিত হয়? শব্দগুলোর শব্দ কিভাবে পৃথক পৃথক বোঝা যায়, উহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এক্ষণে আমি আমার কক্ষ হতে কয়েক প্রকারের শব্দ পাচ্ছি তন্মধ্যে ইরি-বোরো ধানের ক্ষেত হতে সেচ কাজে ব্যবহৃত স্যালো মেশিনের শব্দ, একটু দূরে অবস্থিত জাতীয় সড়ক হতে বাস-ট্রাকের শব্দ বাঁশ কাটার শব্দ, মানুষের কথার শব্দ, কাকের ডাক, বাড়ী ঘর হতে মৃদু শব্দ, প্রতি সেকেণ্ডে ধ্বণীত হচ্ছে। অবশ্য শব্দের উৎপত্তি নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণা হতে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু উহার চূড়ান্ত সমাধান কখনই সম্ভব নয়। কারণ অদৃশ্য শব্দ সম্পূর্ণভাবে উহার স্রষ্টা এক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

বায়ু ব্যতীত আমাদের জীবনধারনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের জানা নেই। এহেন বায়ুও আমাদের ক্ষতি করে এবং কোন কোন অঞ্চলের ধ্বংসও ডেকে আনে। তদ্রূপ শব্দ ব্যতীত মানব জীবনধারণ ও অসম্ভব। যদিও শব্দ কোন কোন সময় কোন কোন অঞ্চলে ক্ষতি সাধন করে, তবুও মানব জীবনে শব্দের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বায়ু ও শব্দের চেয়েও অধিক নিকটতম বস্তুর মধ্যে মাতৃভাষাকেও একটি অন্যতম শক্তিশালী শক্তি হিসেবে সনাক্ত করা যায়। কারণ মাতৃভাষার প্রতিভাশক্তি হতেই বিশ্বের উন্নত ও গঠনমূলক কাজের সূত্রপাত হয়। উন্নত ধর্ম অনুশীলন, সমাজ ব্যবস্থা, সকলের কল্যাণ কামনা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, মহত্ত্ব, নৈতিকতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার, পবিত্রতা , পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক সুবিচার, দুস্থ-দরিদ্র নিঃস্ব মানুষের দুঃখ দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মহৎ গুণাবালীকে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত অকৃত্রিম শক্তির অন্তর্ভূক্ত মনে করা হয়। কারণ আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বাল্যকাল হতেই মাতৃভাষার আধ্যাত্মিক চেতনা হতে আল্লাহর অস্তিত্বের অনুসন্ধানে নিমগ্ন ছিলেন। একমাত্র অন্তর্যামী মহিমাময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ এ সংবাদটি জানত না।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মানবতা-মহানুভবতা ও স্রষ্টার সন্ধানের আকুল মর্মবেদনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর মাতৃভাষায় অহি প্রেরণ করে রাসূল হিসেবে বরণ করে নেন। অতঃপর তাঁর ক্রম বর্দ্ধমান বিশুদ্ধতা পবিত্রতা আল্লহভীতির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হতে তাঁকে সম্মানজনক হাবিব উপাধিতে ভূষিত করেন স্বয়ং মহাবিজ্ঞ আল্লহ তা'আলা এরপর হতেই মহানবী (সাঃ)-এর সম্মান, মর্যাদা, জনপ্রিয়তা, প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে। লোকেরা দলে দলে তাঁর আসাধারণ আদর্শ ও অহিংস উদার ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ইসলামকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বহু পূর্বে ইসলামের অপর শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তিনিও তাঁর ধর্ম্মীয় জীবনে বহু বাধা বিপত্তি ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষার নিবিড় অধ্যাবসায় ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সর্বমহান আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের শীর্ষে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের বিভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তারা সে সময় দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করে নিশ্চিত থাকত অথবা নিজেদের জীবনের সকল বিপদ-আপদ উত্তরণের উপায় হিসেবে মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা অর্চনা করতো। ইবরাহীম (আঃ) তখন তাঁর গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা নিজেদের হাতে মাটি দিয়ে যে মূর্তি তৈরি করছ এবং যে মূর্তির বোধ নেই, ইচ্ছাশক্তি নেই, চলমানতা নেই সেই মূর্তিকে তোমরা কিভাবে পূজা কর? যার কাছে চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না, তার কাছে তোমরা কেন চাও তোমরা তো বুদ্ধিমান মানুষ। নিজ বুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে অনুসন্ধান কর কোথায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন?

ইবরাহীম (আঃ) -এর প্রশ্ন শুনে তাঁর গোত্রের লোকেরা বলেছিলেন, আমরা তাই করি যা আমাদের পূর্বপুরুষ করে গেছেন। আমরা নতুন কিছু করি না। আমরা প্রথা মেনে চলেছি এবং প্রথার সঙ্গেই আমাদের জীবন যুক্ত। কত সুন্দর জবাব ছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বগোত্রীয় লোকদের। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মত একজন নবীর সৎউপদেশ শুনে তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল এবং ভ্রান্ত মানসিকতা পরিহার করে সৎপথ গ্রহণ করা উচিত ছিল, যা তারা করেনি। মাতৃভাষার উৎসারিত এই স্বাধীন অনুভূতির বা আত্মবিকাশের জের আজও চলে আসছে বর্তমান এ অত্যাধুনিক বিশ্বেও।

যাহোক ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম ছিল আল্লাহ্‌র সমর্থনপুষ্ট। তাই আমাদের প্রিয় মহানবী (সাঃ) তাঁর ধর্মের ও আদর্শের বহুলাংশই গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর গোত্রীয় প্রতিবেশী লোকেরাও ইবরাহীম (আঃ)-এর গোত্রীয় লোকদের মত মানসিকভাবে সেই বিপরীত ধারাবাহিকতা হতে সৃষ্ট হিংসা, বিদ্বেষ, হীনতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, বর্বরতা, নির্লজ্জতা, অসৎ আচরণ, সংকীর্ণতা, ক্রোধ, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ পাশবিক আচরণ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। উভয়পক্ষের ভাল ও মন্দ সবই ছিল মাতৃভাষার গভীরে উৎপাদিত জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ।

মূলত পার্থিব জগতে মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট বস্তুগুলির মৌল ধারা প্রায় এক ও অভিন্ন যেমন সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টির পর হতেই এক দিকে উদিত হয় এবং উহার বিপরীত দিকে অস্ত যায়। একই ভাবে প্রাণীজগতের সৃষ্টির পর মানুষ থেকে শুরু করে সকল প্রাণীর পুরুষ প্রজাতি প্রজননের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করে এবং নারী বা স্ত্রী প্রজাতি সন্তান প্রসব ও ডিম্ব প্রসব করে। আদি যুগ হতে আগুন খাদ্য সিদ্ধ করার দায়িত্ব সম্পন্ন করে আসছে। পানি জীব জগতে পিপাসা ও তৃষ্ণা মেটায় এবং পাশাপাশি খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। বায়ু তার নিয়মিত প্রবাহ দ্বারা জীবজগতে প্রাণের সঞ্চার করে। আলো, অন্ধকার, তাপ, ঠান্ডা প্রভৃতি উহাদের পালনকর্তার আদেশ ও নিয়ন্ত্রণে তাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মাতৃভাষাও অনুরূপ ভাবে তার নিজ নিয়ন্ত্রণের উত্তম ও অধম অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটায়।

আসলে মাতৃভাষা মানব জীবনের ও অনান্য প্রাণীর ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মানবজাতির পরিচালক। মানব চরিত্রের উন্নয়ণে বা অধঃপতনে মাতৃভাষার অবদান অনস্বীকার্য। কারণ মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি কখনও নিজে কাজ করতে পারে না এবং পৃথক পৃথক ভাবে কোন কাজ করতে পারে না, উহার পরিচালকের মনের অনুভূতি ব্যতীত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মনের স্বচ্ছতা ছাড়া কেউ পাচঁ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে ছালাত পড়তে পারবে না। মনের স্বচ্ছতার কারণেই একজন ভদ্রোচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পথ চলে, দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে, অহেতুক কথা বলেনা এবং বিনা প্রয়োজনে কারও কথা শোনেও না। পক্ষান্তরে মনের কলুষিত চিন্তাধারা নিয়ে চলা পথিক কখনও মসজিদে ছালাত পড়তে যাওয়ার চিন্তা করবে না। মনের পঙ্কিলতার কারণেই তার লম্পট আচরণ নিজের

চোখকে সংযত রাখতে পারবে না, অহেতুক কথা বার্তা বলবে ও শুনবে বিনা কারণে।

মানুষ তার সুচিন্তিত চিন্তাধারা হতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বা শিল্পের আবিষ্কার করেছে এবং ক্রমান্বয়ে বৃহৎ শিল্পের দিকে এগিয়ে শিল্পক্ষেত্রে আকাশচুম্বী সাফল্য অর্জন করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কারেও যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে বর্তমান বিশ্বে আজ তা অজানা নেই। বর্তমান বিশ্বের কম্পিউটার পদ্ধতি এবং সাম্প্রতিক মোবাইল ফোনের ব্যবহার অভিজাত শ্রেণীর রাজমহল হতে দরিদ্র পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে প্রতিযোগিতায় সদাব্যস্ত ভূমিকা পালন করছে। মানুষের জ্ঞানের এই অগ্রগতি তার জীবনের লক্ষ্যের ফলাফল এবং মাতৃভাষা হতে সৃষ্ট গবেষণার ফসল।

মাতৃভাষায় কুরআন নাযিল মানবতার নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সকল অমানবিক কার্যকলাপের রহিতাদেশ এবং সকল রুচিপূর্ণ কাজ মাতৃভাষার পূর্ণ স্বীকৃতি। পবিত্র কুরআন সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক। তম্মধ্যে যারা এক আল্লাহই বিশ্বাসী তাদের জন্যে অনন্যোপায় কর্তব্য। পবিত্র কুরআনের পূর্বেও বহু নবী-রসুলের উপর ধর্মীর গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁদের উম্মতের প্রতিও আদেশ-নিষেধ মান্য করার কঠোর আদেশ ছিল। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় বহু উম্মত আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ধ্বংস হয়েছিল। এখানে সংক্ষেপে দুটি উদাহরণ তুলে ধরলাম (১) মালেক ইবনে দীনার (রহ:) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতাগণ আরয করলেন, এ বস্তিতে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও। আমার অবাধ্যতা, পাপাচার দেখেও তার চেহারা ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

(২) হযরত ইউশা ইবনে নুন (আঃ)-এর প্রতি অহি আসে যে আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎলোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই। কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল, এ সৎলোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি (বাহরে মুহীত)।

আল্লাহর আদেশ পালন করা বা তাঁর প্রেরিত ঐশীবাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থের অনুসরণ করা আবহমানকাল ধরে মানব জাতির এক ও অভিন্ন ধর্মাদর্শ। কিন্তু অনিবার্য কারণে ধর্মের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় ও বিশ্বস্ত বান্দাগণকে পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের থেকে আলাদা থাকার পরামর্শ দেন। জাগতিক কোন কারণে তাদের সাথে কৃত্রিমভাবে চলাফেরা করা যায় কিন্তু তাদের সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপন ইসলামে নিষিদ্ধ। কমপক্ষে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণের আদেশ রয়েছে। উপরোক্ত দুটি ঐতিহাসিক বর্ণনায় বলা হয়েছে, পাপ কাজ বা পাপীদের সাথে পূন্যবানদের অবৈধ ও নীরব, বন্ধুত্ব আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হিসেবে, পরবর্তী উম্মতদের সতর্কবাণী স্বরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যতদিন ধর্মীয় মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র অবস্থানে ছিল। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা তাদের সঠিক কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে বা ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধ দমনে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথাযথ ভূমিকা পালনে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছে তখন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে পিতা-মাতা ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী, কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের কথাবার্তা, মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্নখাতে প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কুরআন ও হাদীস সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এর প্রতি জোর তাগিদ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী সহজ নয়, তবে যাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠ করেন, ধর্ম চর্চা করেন, ধর্ম নিয়ে নিবিড় গবেষণা করেন, তাঁদের পক্ষে এ বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অপেক্ষকৃত অনেক সহজ। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যারা কুরআন-হাদীস পড়তে পারে না বা জানে না অর্থাৎ নিরক্ষর তারাও এ বাণীটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। অবশ্য এর অন্তর্নিহিত অর্থ কঠিন হলেও সাধারণ অর্থ সরল সহজ ও অনেকেরই বোধগম্য। আমরা বাল্য, কিশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে দেখেছি, তৎকালীন (প্রায় ৫০ বছর পূর্ব)

সমাজে সৎকাজের প্রতি সর্মথন ও অসৎ কাজের প্রতি ঘৃণা ছিল তীব্রতর। সমাজের অভ্যন্তরে ছোট-বড় অন্যায় হতো এবং ঐসবের বিচারে সমাজের সর্বস্তরের লোক সন্তুষ্ট হতো।

তখন শিক্ষিতের হার ছিল খুবই অল্প, সমাজের নেতৃত্বে নিরক্ষর পণ্ডিতদের ভূমিকার ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁরা শুধু মাতৃভাষার জ্ঞানেই পরিচালিত হতেন এবং নিকটবর্তী আলেমদের নিকট হতে প্রয়োজন মত ধর্মীয় ও সামাজিক জ্ঞানলাভ করতেন। অতঃপর বড় বড় বিচার কাজে তাঁরা অসাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করতেন। বিচার চলাকালীন সময়ে মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ, দুস্কৃতিকারী প্রতারক সহ ক্ষুদ্র অসৎচক্র ভয়ে ভীতু থাকত। কারণ বিচারকমণ্ডলী মাতব্বরদের প্রতি নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল অকৃত্রিম। ফলে বাদী বিবাদী উভয়েই বিচারক মণ্ডলীর প্রতি বিনয়াবনত ভূমিকা পালন করতো। এদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস মাতৃভাষা। এভাবে অনেক মানুষ অসাধ্য সাধন করে ও অসাধ্য সাধারণের চেষ্টা করে দুনিয়ার বুকে অমর হয়ে আছেন।

কিন্তু বর্তমান গ্রামবাংলার চিত্র মাত্র ৫০ (পঞ্চাশ) বছর পূর্বের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। এই সেই দিনের কথা বর্ণনা করলে যেন রূপ কথার গল্পের মতই মনে হবে। অথচ তখন এদেশের মানুষ ছিল আজকের তুলনায় অনেক অনগ্রসর এবং অনেক অসুবিধার মুখোমুখী পরিবেশে। কিন্তু স্বচ্ছতা, সততা, মানবতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলীর অভাব ছিল না। আর আজ সেগুলির স্থানেই উপরে বর্ণিত নিরক্ষর পণ্ডিতদের বিপরীতে দেশে বড় বড় শিক্ষিত পণ্ডিতের জন্ম হয়েছে কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, বাংলার ইতিহাসে কল্যাণের পরিবর্তে তা কলংকের অধ্যায় হিসেবেই সংরক্ষিত থাকবে।

এ অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বাংলার ইতিহাসে কালিমা লেপন আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের পথে, বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা মাতা ও মাতৃভাষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করে দেশ ও জাতির নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সারা দেশে এখন ঐসব বিশ্বাসঘাকতদের অনুচরেরা সাময়িক ভাবে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে বেড়াচ্ছে। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তৃণমূলপর্যায় পর্যন্ত এই অনভিপ্রেত অভিযান সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ হতে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ব্যাপক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষায় অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মাতৃভাষা ছাড়া মানুষও অবোধ প্রাণী

মাতৃভাষা আল্লাহর দান। আল্লাহ অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের একমাত্র মালিক। তাঁর এই মহাজ্ঞান হতে সৃষ্ট বস্তু সমূহের সঠিক জ্ঞান তিনি ছাড়া কারো নেই। মানুষ কোন প্রকারে তাদের নিজেদের সংখ্যার একটা মোটামুটি পরিসংখ্যান নির্ণয় করে পৃথিবীর লোকসংখ্যা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এটা মোটেও সঠিক সংখ্যা নয়, কারণ সমগ্র পৃথিবীতে অনিয়মিতভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকাল মৃত্যুবরণ করছে এবং জন্ম গ্রহণও করছে অনুরূপ হাজার হাজার শিশু। এমতাবস্থায় সঠিক বলতে যা বোঝায় সে সংখ্যা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাহোক তবুও মানুষের সংখ্যার সমন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু পশু-পাখী সম্বন্ধে কোন ধারণা করা শুধু শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন মাঝে মাঝে সংবাদ মাধ্যমে বাঘ, সিংহ, হাতী, হরিণ, প্রভৃতি বড় বড় বন্য পশুগুলোরও সংখ্যা উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু বড় বড় পশু-পাখীগুলো ছাড়া ছোট প্রজাতির পশু-পাখী গুলোর পরিসংখ্যান কখনও শোনা যায় কি? তাছাড়া ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের কথা গণনা করা তো দূরের কথা; অনুমান করাও তো অসম্ভব। এদের সঠিক ও সত্য পরিসংখ্যান একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা জানেন। এতদ্ব্যতীত ভূমণ্ডলের দুই তৃতীয়াংশই সাগর-মহাসাগর দ্বারা আবৃত। এই মহাব্যাপক জলরাশিতে যে কত প্রকারের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ রয়েছে তার হিসাব মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট এ হিসাব অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

বিশ্বজগতের বিশাল ভূভাগে অগণনীয় ও অবর্ণনীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর পাশাপাশি রয়েছে আরও অসংখ্য দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুসমূহ। তন্মধ্যে ভাষা বা মাতৃভাষা অন্যতম গুরুত্বের দাবীদার। ভাষা নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য সম্পদ। ভূপৃষ্ঠে জন্মগ্রহণকারী কোটি কোটি প্রাণী মায়ের পেট হতে মাতৃভাষার আলো নিয়েই ভূমিষ্ট হয় এবং মাতৃভাষাতেই তার অনুভূতি ব্যক্ত করে। আর কোটি কোটি প্রাণী ও উহার কোটি কোটি ভাষার স্রষ্টা এক আল্লাহ তা'আলা। তিনি সকল ভাষার অর্থবিশারদ বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তিনি সবার শ্রেষ্ঠ মানুষকে তার উত্তম ভাষা জ্ঞান দ্বারা পবিত্র

কুরআনের মাধ্যমে বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যময় জ্ঞান অন্বেষণের আহ্বান জানিয়ে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, "তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তোমাদের সেবার নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবসকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ' (ইবরাহীম ৩২-৩৪)।

একই মর্মার্থে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ করা' (১৬ নাহল ১৮-১৯)। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত গণনা করতে চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই একটি অদ্ভুত বিষয়। তার এই সামান্য দেহের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, হাত, পা, প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত আছে। শত শত সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অভিনব উপাদান সজ্জিত এই চলমান শ্রেষ্ঠ প্রাণীটি তার নিজের শরীর ও মনের অসংখ্য নেয়ামত, যেমন হাত, পা, মাথা ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গর বৈচিত্রময় অগনিত লোম, প্রভৃতির সংখ্যা গণনা করতেই ব্যর্থ হবে।

এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু সমূহ যেগুলি নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এগুলোর শেষপ্রান্তে পৌঁছা একেবারে অসম্ভব। অত্যন্ত সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে শেষ প্রান্তে নেয়ামত মনে করা হয়। নেয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রাত্যহিক দুর্ঘটনা রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নেয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এসব

থেকে অনায়াসে বিশ্বাস করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামত গণনা করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত এই অসীম, অগণনীয় ও অকল্পনীয় নেয়ামত ভাণ্ডার শুধু মানব জাতির জন্যেই নয়, বরং সমগ্র জীব জগতের জন্যও। তবে সবার মাঝে মানুষ অনন্য, শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের উৎস তার জ্ঞান, আর এই জ্ঞানের উৎস তার মাতৃত্বের স্নেহপরশ হতে প্রাপ্ত অনুভূতি ও মাতৃভাষা। মাতৃভাষার জ্ঞান দ্বারাই শুরু হয় মানব জীবনের স্বচ্ছ অগ্রযাত্রা। কিন্তু কোন কারণে যদি কোন মানবশিশু সমাজচ্যুত হয়ে বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্বতের ভিন্ন পরিবেশে চলে যায়, তবে তার অবস্থা স্বাভাবিক শিশুর মত হবে না ভিন্ন হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমরা ফেরেল মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

ফেরেল মানুষ হলো এমন কতকগুলো হতভাগ্য মানুষ, যারা অদৃষ্টের দুর্বিপাকে আজন্ম মানব সমাজের বাহিরে থেকে অজানা পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩১ টি ফেরেল মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব মানব সন্তানদের সবাই অস্পষ্ট (অবোধ প্রাণীর মত) উচ্চারণ করতে পারত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাটতে পারত না। এসব মানুষ খুব সহজে গাছে চড়তে পারে। এদের মধ্যে কয়েকজন শিশু কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে শিখলেও তাদের অনেককেই ভাষা ব্যবহার শেখানো সম্ভব হয়নি।

ড: এ, এল সিংহ (১৯৩০) ভারতের অরণ্যে বাঘে পোষা দুটি মেয়ের সন্ধান পান। বড় মেয়েটির নাম কমলা আর ছোটটির নাম অমলা। বাঘের আস্তানা থেকে লোকালয়ে আনার কিছুদিন পরই অমলা মারা যায়। অমলার মৃত্যুর পর শোকাহত কমলা দু'দিন পর্যন্ত কিছু খায়নি। অমলার প্রতি কমলার অনেক ভালবাসা ছিল। কমলা প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল। কমলা হাটু ও কুনুইয়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিত এবং দুহাত দু'পা ব্যবহার করে চলাফেরা করতো। সে কাঁচা মাংস খেত। কমলা রাতের অন্ধকারে ভাল দেখতে পেতো, কিন্তু তীব্র আলো দেখে ভয় পেতো। তাকে কখনো কাপড় পরানো সম্ভব হয়নি। জোর করে পোষাক পরানো হলে সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলতো।

দু'বৎসর প্রশিক্ষণ দেবার পর সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো এবং চার বৎসর প্রশিক্ষণ শেষে হাঁটতে শিখেছিল। কমলা ৬টি শব্দ শিখেছিল চার

বৎসরে এবং ৪৫ টি শব্দ শিখেছিল সাত বৎসরে। এ সাত বৎসরে সে অন্যান্য মানুষের কাছে এসে আনন্দ পেতো। পরে সে হাত দিয়ে খাবার খেতে শিখে ধীরে ধীরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তবে ১৭ বৎসর বয়সে কমলার যে পরিমাণ বুদ্ধি হয়েছিল, তা একজন চার বৎসর বয়সের স্বাভাবিক শিশুর বুদ্ধির সমান।

অমলা-কমলার ন্যায় বাঘের আস্তানা থেকে আরো ১৪টি, ভল্লুকের লালিত ৫টি, বনমানুষ স্তন দিয়েছে একটি এবং চিতাবাঘ ও ভেড়া ১টি করে মানব শিশু লালন করেছে। তাছাড়া বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীলংকায় ১২ বৎসর বয়স্ক একটি মেয়েকে অরণ্য থেকে উদ্ধার করা হয়।

উপরোক্ত ফেরেল মানুষেরা কোথা হতে কিভাবে সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে যায় তার ইতিহাস জানা না থাকলেও এ বিষয়ে কমবেশী অনুমান বা ধারণা সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই রয়েছে। বর্তমান সভ্য সমাজেও মাঝে মাঝে শোনা যায় ও সংবাদ মাধ্যমে পাওয়া যায় সদ্য নবজাত শিশুকে ডাস্টবিনে অথবা কোন নিরাপদ জায়গায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তার প্রসূতি মা বা তার সহযোগীরা। আল্লাহর ইচ্ছায় ও অদৃষ্ট লিখনে এই সব শিশুর অনেকে ভাল ঠাঁই পেয়ে যায়। আবার অনেকে যত্নের অভাবে বা ভাগ্যের লিখনে মৃত্যুবরণ করে।

যাহোক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও যথাযথ পরিবেশ না পেলে বা মনুষ্য সমাজ থেকে মাতৃক্রোড়ে মানুষ হতে না পেলে তার আচরণেও মানুষের কোন নমুনা থাকে না। দীর্ঘকাল পশুর আস্তানায় থেকে পশুদুগ্ধ খেলে বা অন্য খাবার খেলে তার মনুষ্য স্বভাব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সেও একটি অবোধ প্রাণীতে পরিণত হয়ে পড়ে। উপরোক্ত ফেরেল মানুষের তথ্য হতে এ বিষয়ে জ্বলন্ত সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত মাতৃভাষায় জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষ যদি ফেরেল মানুষের মত কোন বিশেষ কারণে বহু দূর দেশে ছিটকে পড়ে, আর যদি সে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা না জানে অথবা সেখানে তার ভাষাভাষি কোন লোক না পায়, তবে সে একান্ত অসহায় ও অবোধ প্রাণীর মত হয়ে পড়বে। উদাহরণত একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করছি। আজ হতে প্রায় ৬২/৬৩ বছর আগে ১৯৪৩ -৪৪ সালের দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে, পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবান জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯ নং সেখ আলীপুর ইউনিয়নের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি বৃটিশ

বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিমানের দু'জন পাইলটের মধ্যে এক জন নিহত ও একজন জীবিত ছিলেন। আমি তখন প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ৭/৮ বছর। একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা বলে বিষয়টি ভালভাবেই মনে পড়ে। বিমানটি কলকাতা হতে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। যান্ত্রিক গোলযোগের মধ্য দিয়ে বিমানটি যখন আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখনই বিমানটিতে আগুন দেখা গিয়েছিল। আমাদের বিদ্যালয় থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দুরে গিয়েই বিমানটি প্রচন্ড শব্দে মাটিতে বিধস্ত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হতে লোকজন ছুটাছুটি করে বিমানের দিকে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আমরা আমাদের শিক্ষকের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে গেলাম, তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য।

বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে বিমানের দিকে অগ্রসর হয়ে পাইলটদ্বয়কে উদ্ধারের চেষ্টা করে এবং একজনকে জীবিতাবস্থায় বের করতে সক্ষম হয়, অপর জন মারা যায়। জীবিত পাইলট তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজীতে অনেক কথা বলে লোকজনকে তাঁর বিপদের কথা ও প্রয়োজনের কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল খুবই কম, পরন্তু ইংরেজীতে কথা বলার লোক ছিল না। তাই প্রায় আধা ঘন্টা ধরে পাইলটের মাতৃভাষা ইংরেজীর গভীর আর্তনাদ ও মর্ম কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন শত শত অবোধ বাঙ্গালী। ইত্যবসরে ঘটনাস্থল হতে প্রায় তিন কিলোমিটার দুরে অবস্থিত এক উচ্চ বিদ্যালয় হতে ছাত্র ও শিক্ষাকমণ্ডলী ঘটনাস্থলে পৌছে যায়। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এগিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাঁকে যথাযথ কতৃপক্ষের নিকট পৌছানর ব্যবস্থা করেন।

মাতৃভাষায় জ্ঞানের গুরুত্বের আলোচনায় উপরোক্ত পাইলটদ্বয়ের ব্যাপারে আরও জানা যায় তাঁরা শেষ মুহূর্তেও কোন প্রকারের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহত রক্ষা করতে গিয়ে দুই গ্রামের মধ্যবর্তী একটা সংকীর্ণ জায়গায় বিমানটিকে ভূপাতিত করেন। সেখানে দু' গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানের ব্যবধান ছিল মাত্র এক কিলোমিটারেরও কম। গ্রাম দুটি যে কোন ক্ষতির হাত হতে রক্ষার পায় সে জন্য পাইলট দ্বয় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বলে জীবিত পাইলট জানান। অপরদিকে দুটি গ্রাম নিকটবর্তী হওয়ায় লোকজন তাড়াতাড়ী ছুটে এসে জীবিত পাইলটকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। মানুষ

শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে একে অন্যের প্রতি সদয় ও ভালবাসার নিদর্শন মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মানব সন্তান জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে মানুষ হতে হতেই, মায়ের ভাষা বীজরূপে প্রাপ্ত হয়ে মাতৃভাষার বীজ অঙ্কুরোদগাম হয়। এটা পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন জাতির যে কোন ধর্মের যে কোন ভাষার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু উক্ত মানবশিশু যদি ভূমিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরই সমাজচ্যুত হয়ে যায়, তবে উপরোক্ত ফেরেল শিশুদের মতই অবস্থা দাঁড়াবে সকলেরই। আবার কেউ যদি হঠাৎ উপরিউক্ত বিমান দুর্ঘটনার মত কোন কারণে দূরদেশে একাকী অবস্থায় পড়ে যায়, তবে সেখানে তাকে বেশ দীর্ঘ সময় অবোধ প্রাণীর মতই কাটাতে হবে। তবে যাই ঘটুকু মাতৃভাষায় পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তার অন্তরে মানবতার অদৃশ্য গুণাবলী সংরক্ষিত থাকবে।

পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত ও লেখকগণ তাঁদের অসামান্য প্রতিভার দ্বারা বহু মূল্যবান কাব্য-মহাকাব্য ও বিবিধ গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে সে সব গ্রন্থ-মহাগ্রন্থের রচয়িতার জন্য চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরআনের ধারক ও ব্যাখ্যাকারক। কুরআন রচনায় তাঁর বিন্দুমাত্রও কোন অংশ বা সহযোগিতা নেই। কাজেই যে কোন সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসাবেই অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ নেতা ও নবীরাসুল হিসেবে মান্য করে।

পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত (কিয়ামত) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র কুরআন আল্লাহর কিতাব হিসেবে দুনিয়ার বুকে শীর্ষস্থানে সমুন্নত থাকবে। যেমনভাবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও আমাদের জাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক ভাবেই থাকবে মনে করি। আরবী ভাষাও আরব জাতির জন্য অক্ষুণ্ন থাকবে। একইভাবে দুনিয়ার সকল দেশ ও জাতির নিজেদের ভাষা ও মাতৃভাষা বহাল থাকবে। তদ্রুপ পবিত্র কুরআনও আল্লাহর কিতাব হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সমুন্নত থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় ও অকৃত্রিম বিশ্বাস থাকতেই হবে।

মানব রচিত ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, মহাকাব্য, প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, নাটক প্রভৃতির লেখক বা রচয়িতা আমাদের নিকট পরিচিত এবং বিশ্বাস

যোগ্য। এদের রচনায় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বাস্তবতার সঙ্গে রচয়িতার ব্যক্তিগত কল্পনা ও মতামত প্রতিবিম্বিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু বিশ্বের অদ্বিতীয় মহাগ্রন্থ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কোন অবাস্তব, অহেতুক, কোন আলোচনায় করেননি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বৃহৎ হতে ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু তথা উপদেশ, আদেশ, নিষেধ, আদর্শ, উত্তম, মধ্যম, অধম, কাহিনী, তথ্য, ইত্যাদি বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও সত্য। এখানে মিথ্যা, কল্পনা, অতিরঞ্জিত, অমুলক, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মূল্যহীন, সন্দেহাত্মক কোন বিষয়ের স্থান নেই, তাই অমূল্য মহাগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও আত্মবিশ্বাস মানবজীবনের বিশেষ করে জ্ঞানী ও ঈমানী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। যেহেতু কুরআনকে সর্বাধিক হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই আরবদের ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাতৃভাষা আরবীতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর জ্ঞানী পণ্ডিতগণের অক্লান্ত গবেষণা ও সাধনায়, কুরআন বর্তমানে বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু অনুবাদই নয় পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অনুবাদের পাশাপাশি। আবার কুরআন পাঠকে সহজ করার জন্য মাতৃভাষায়ও উচ্চারণও লিখা হয়েছে। অর্থাৎ আরবী কুরআনকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করার প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমে আরবী আয়াতের নীচে বাংলায় আরবীর উচ্চারণ লিখা হয়েছে। অতঃপর বাংলা উচ্চারণের নীচে বাংলায় অর্থ বা অনুবাদ করা হয়েছে। এতে অল্প আরবী জানা ব্যক্তির সুবিধা হয়েছে। তবে এ সুবিধা কিশোর বা যুবকদের গ্রহণ না করা ভাল। কারণ তারা একটু চেষ্টা করলে স্বল্প সময়েই কুরআন শিখতে পারবে অনায়াসে। এ ক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিদের বেশ সুবিধা হয়।

বিভিন্ন দেশের ভাষায় বা মাতৃভাষায় কুরআনের সফল অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ভাষা বৈষম্যের অসুবিধা বিদূরিত হয়। অবশ্য ধর্মের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কুরআনের কিছু অংশ বা কিছু সহজ অংশ পাঠ করা যা মুখস্থ করা বাধ্যতামুলক। বিশেষ করে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কালে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পড়তে হয় এবং আরবীতে কিছু দোয়াও পড়তে হয়। এতে পরম করুনাময় আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সহজ অংশগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কোন বিশেষ অংশ বাধতামুলক ভাবে পড়ার আদেশ করেননি। এটা নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের জন্য সুখবর। মহান আল্লাহ বলেন, "কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের পক্ষে সহজ,

ততটুকু আবৃত্তি করো। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে সফরে যাবে আর কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ তোমরা ততটুকুই আবৃত্তি করো' (৭৩ মুজাম্মিল-২০)।

অন্য এক আয়াতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ বলেন, "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে' (৫৪ কামার ১৭, ২২)? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে প্রত্যাদেশ করেন যে আমি এ কল্যাণকর কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধশক্তি সম্পন্নরা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহন করবে' (৩৮ ছোয়াদ-২৯)।

পৃথিবীতে যত প্রকারের ভাষাই থাক না কেন মানব জাতির সুবিধার্থেই তা সৃষ্টি হয়েছে। আর সকল ভাষার সৃষ্টির রহস্য, উদ্দেশ্য ও মূল মর্মবাণী এক ও অভিন্ন। যেমন মানবজাতির সকলেরই হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মাথা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই কাজের জন্য সৃষ্টি এবং উহারা সকলে প্রায় একই কাজ করে। একজন সুন্দর নর-নারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, অনুরূপভাবে অপর একজন অসুন্দর নর-নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে কাজের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যমীনের বুকে ভাল খাদ্যশস্য, ফলমূল, পানীয় প্রভৃতি যেমন খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়, মানুষের মনের কথা বলার জন্যে এবং অন্যের প্রকাশিত কথা বোঝায় জন্যে প্রধানত মাতৃভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ভাষা সুন্দর হলেও মনের কথা যেভাবে প্রকাশ করা যাবে অন্যের নিকট হতে সেভাবে বুঝেও নেয়া যাবে।

সুতরাং জগতের সকল মাতৃভাষার অভ্যন্তরে সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান রয়েছে। আমরা জেনেছি কুরআন নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায় যা শুধু আরবদেরই মাতৃভাষা। কিন্তু আরবী ভাষা হতে অনুবাদ করে আমরা যা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে, পবিত্র কুরআন পরোক্ষভাবে সকলেরই মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ কুরআনের অসংখ্য বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় কোন জটিলতা নেই বললেই চলে। আবশ্য কিছুসংখ্যক জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে আয়াসসাধ্য বলে আল্লাহই জানিয়ে দিয়েছেন। সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

পবিত্র কুরআনের যে কোন বর্ণনায় মাতৃভাষার সরল, সহজ ও সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। অর্থাৎ আরবীতে অবতীর্ণ হলেও কুরআনের ভাষায় জটিলতা;

নেই বরং অত্যন্ত সরল-সহজ ও সাধারণ জীবন যাপনের উপযোগী ভাষায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় জটিলতার অজুহাত খাড়া করে ধর্মের অনুশীলন হতে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে যদি ইংরেজী মাধ্যমে ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দেয়ার পরিকল্পনা করা যায়, তবে পরকালীন স্বার্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ধর্মের কাজে কিছু সময় ব্যয় করে ধর্ম শিক্ষা লাভ আপত্তি কী? এধরনের গাফেলতি করতে আল্লাহ বার বার নিষেধ করেছেন। এ দেরকে সৎ পথপ্রদর্শনের জন্য মহাধৈর্যশীল আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাঃ) কে প্রত্যাদেশ করেন যে, "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে যারা সঠিক পথে আছে' (১৬ নহল ১২৫)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ–

'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।' (২৩ মুমিনুন-৬২)।

মহাবিজ্ঞ আল্লাহ আরও বলেন,

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً– لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً– وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً–

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' (১৯ মরিয়ম ৯৩, ৯৪, ৯৫)।

এ অধ্যায়ের আলোচনায় মাতৃভাষার জ্ঞান ছাড়া মানুষও অবোধ প্রাণী এর সমর্থনে ইতোমধ্যে কিছু কিছু যুক্তি ও উদাহরণ তুলে ধরেছি। আসলে নিজের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা ছাড়া কথা না বলার বা মাতৃভাষায় কথা না বলার কোন কারণই থাকতে পারে না। একমাত্র অক্ষম অযোগ্য, পাগল ও

প্রতিবন্ধীরাই কোন ভাষা বা মাতৃভাষা বোঝে না। তারা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের কিছু ইশারা-ইঙ্গিতেই চলে। এখানে বোধশক্তি সম্পন্নদের কিছু করার নেই, তবে বোঝার অনেক কিছুই আছে।

যেমন এ পৃথিবীতে অনেকেই ধর্ম-কর্ম মানে না, বা ধর্মপালন করতে চায় না -এর কারণ মহান আল্লাহই ভাল জানেন। আর যারা তা করে না বা করতে ইচ্ছুক নয় তারাও কিছু জানে। যারা ধর্ম পালন করে না বা করতে চায় না তাদেরকেও দেখা যায় মুমূর্ষু অবস্থায় আল্লাহকে ডাকে, দোআ করে এবং দেশের মানুষের কাছে দোআ চায়। অতঃপর মৃত্যুবরণ করলে, কাফন-দাফনসহ যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি ধর্মীয় বিধানের আওতায় সমাধান করা হয়। পরবর্তীকালে তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে যাকযমক সহকারে অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু বড়ই পবিতাপের বিষয় এরা যদি আন্তরিকভাবে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে না থাকে তবে তো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই অন্ধকার হতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং প্রতিবন্ধীদের মত অবস্থা দাঁড়াবে।

সুতরাং যারা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরকে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই, এই মহান বাক্যের প্রতি বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া বাধ্যতামূলক। এই কঠিন আদেশের পরও কোন জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যদি ধর্মকে অবজ্ঞা করে তবে সে একান্তভাবেই আল্লাহর সম্মুখে অবোধ প্রাণীর ন্যায় অসহায় হয়ে পড়বে।

মাতৃভাষার পাশেই ধর্ম

ইতো পূর্বে আলোচনা করেছি, পৃথিবীর বুকে কতকগুলো মুল্যবান বস্তু নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে আমাদের জীবনকে আবদ্ধ করে রেখেছে। সেগুলোর মধ্যে আসমান-যমীন, সুর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-তাপ, বায়ু-পানি, শব্দ প্রভৃতি প্রধান। এ সৃষ্টিগুলোর যে কোনটির অভাবে মানুষ সহ সকাল প্রাণীর জীবন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত রয়েছে আরও অসংখ্য উপকারী জানা আজানা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তুসমূহ যেগুলোতে আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, রয়েছে শুধু অবাধ ব্যবহারের অধিকার। অবশ্য ভূমণ্ডলের সকল প্রাণী সমানভাবে এ অধিকার ভোগ করে থাকে। এসব অসাধারণ সৃষ্টিরাজির ব্যাখ্যাই এক অত্যাশ্চর্য, বর্ণনা,যা সাধারণ মানুষ কখনও কল্পনা করতেও সক্ষম নয়।

আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণাকারী (৩৯ যুমার-৬২)। মুলত এই প্রতিপাদ্যের মধ্য দিয়ে ইহজগতে প্রতিটি প্রাণীর যাত্রা শুরু হয়েছে এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা শেষ হবে। সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্বজগতের অসংখ্য সৃষ্টিরাজি নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে। কিন্তু উপরোক্ত বড় বড় সৃষ্ট বস্তুসমূহের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা ব্যবস্থায় মানুষের কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই। আসলে ঐগুলো সমস্তই মহাপরাক্রমশালী মহা জ্ঞানবান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় সীমাবদ্ধ এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের উপকারে নিয়োজিত রয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ঘোষিত বাণী হলো 'তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে, আর নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবসকে তোমাদের কাজ লাগিয়েছেন। যে সমস্ত বস্তু তোমরা চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর তবে গুণে শেষ করতে পারনে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ' (১৪ ইবরাহীম–৩২-৩৪)।

মানুষকে জ্ঞান দানের জন্য মহান আল্লাহ বলেন, "আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। আমি জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়' (১৫ হিজর ১৯-২৫)।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার মহাক্ষমতা ও মহানিদর্শনের সামনে মানুষ একান্তই অসহায়, এ বিষয়ে অন্তর্নিহিত অবগতিতে সর্বমহান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেন যে, "তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হলো। নৌকাগুলোর উপর এলো তীব্র বাতাস আর সর্বাদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারলো যে তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগলো আল্লাহকে তাঁর ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে। যদি আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোলেন তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও। অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে হবে। তখন আমি বাতলে দেব যাকিছু তোমরা করতে। পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এলো যা মানুষ ও জীব -জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভয়ে উঠল আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে। তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল

না। এমনি ভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শনসমুহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে' (১০ ইউসুফ ২২, ২৪)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে মানুষের উপকারে যা লাগে তা নিয়ে জাহাজের সমুদ্রযাত্রায়, সেই বৃষ্টিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন যার দ্বারা তিনি মৃত পৃথিবীকে পূনরুজ্জীবিত করেন ও সেখানে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ঘটান আর সেই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত সেই মেঘমালায় জ্ঞানী লোকের জন্য তো বহু নিদর্শন রয়েছে' (২ বাকারহ -১৬৪)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব প্রতিনিধিকে তাঁর অসীম রাজত্বের অসীম ক্ষমতার শান্ত ও সুশৃংখাল নিয়ম ও নিদর্শন সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের মাথার উপর মহাশূন্য মহাকাশসমূহ ও বিশাল যমীন এক সীমাহীন অকল্পনীয় অবর্ণনীয় অদ্বিতীয় অসাধারণ সৃষ্টি এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, দিবা-রাত্রি, ঝড়-বৃষ্টি, ফল-ফলাদি, আহার-নিদ্রা, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্য এর অন্তরালে রয়েছে জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষাণীয় বিষয়।

যেহেতু মানব জাতির সৃষ্টি রহস্য মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর একান্ত একক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তাই মানব সৃষ্টির বিষয়টি সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলে তারা বাধা প্রদান করে। ফেরেশতাদের বাধা প্রদান এবং রহস্যময় আল্লাহর ইচ্ছা ও মহাজ্ঞানের বিষয়টিও পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান অত্যাধুনিক জ্ঞানবুদ্ধি চর্চার যুগেও ধর্মীয় অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে সমাজের সাধারণ মানুষ এমনকি অনেক শিক্ষিত পণ্ডিতও এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকায়, বিষয়টি সকলের অবগতির প্রয়াসে উপস্থপন করা হলো।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সাঃ)-এর বরাবরে প্রত্যাদেশ করেন যে, "আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তণ করছি এবং আপনার পবিত্র সত্ত্বাকে স্মরণ করছি। আল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে আমি

জানি, যা তোমরা জানো না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কোন কিছুই জানিনা, তবে আপনি যা আমাদিগকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমত ওয়ালা। আল্লাহ বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর তিনি (আদম) যখন বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি ? সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর' (২ বাকারাহ- ৩০-৩৩)।

ফেরেশতাদের সঙ্গে কথোপকথনের পর মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর উন্নত ও উচ্চাভিলাষী চিন্তাশক্তিদ্বারা মানবরূপী আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পছন্দের সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা মন্ডলীকে আদেশ করলেন আদম (আঃ)-কে সিজদা করতে। কিন্তু ইবলীস সিজদা করেনি। কারণ মাটির তৈরি মানুষকে এত বড় সম্মান দেখানো তার পছন্দ হয়নি। সে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিলো এবং মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অনান্য ফেরেশতাগণ সঠিকভাবেই বুঝেছিল যে মানব সৃষ্টির নেপথ্যে আল্লাহ তা'আলার মহান উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। তাছাড়া মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত আদেশ আমান্য করার মত ঔদ্ধত্য তাদের ছিল না। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ইবলীস যে অপুরণীয় ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল বা হয়েছে তা বুঝাতে ফেরেশতাদের অসুবিধা হয়নি।

যাহোক সিজদা অনুষ্ঠানের পরবর্তীকালে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে ইবলীসের প্ররোচনায় কৃত ভুলের জন্য আদম (আঃ)-কে বেহেশত হতে পৃথিবীতে নির্ধাসিত হতে হয় এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দায়িত্ব অর্পিত হয়। সেই সম্মানজনক দায়িত্বের মধ্যে শীর্ষ হলো, এক আল্লাহর অনুগত্যে থেকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর প্রেরিত নবী-রাসুলগণের আদর্শ বাস্তবায়িত করা। শয়তান ইবলীসের প্ররোচনায় বা ধোঁকায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে পড়ে কোন শক্তির সাহায্য নেওয়া বা তার আনুগত্য করা বা পূজা করা হতে বিরত থাকা। যেহেতু আদম (আঃ)-কে সিজদা করার অনুষ্ঠান হতে শয়তানের বিদ্রোহ, অতঃপর বিতাড়ন ছিল

মানব জাতির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ ঘটনার পর হতে শয়তান মানুষের চিরশক্র হিসেবে তার অভিযান শুরু করে। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় কিছু পরিবর্তিত ভাষায় প্রত্যাদেশ করেছেন, যাতে দুনিয়ার মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। অথাৎ আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়ে মিথ্যাবাদী শয়তানের পথে চলে না যায়।

অবশ্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীর শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ গুণ, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার ও বিবেকও মানুষকে দান করেছেন। বস্তুত শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ফলে পৃথিবীর বুকে মানুষ যে অসাধারণ জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে, সেগুলির সঠিক, সুন্দর, নিবিড়তর ও অকৃত্রিম প্রয়োগ প্রণালীই হলো ইবাদত, যা শুধু মানুষ ও জিন জাতির জন্যই অবধারিত হয়েছে। অতঃপর ধর্মের বা ইবাদতের আইন-কানুন, বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ, ভাল-মন্দ ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরিসরে প্রবেশ পথের প্রধান সহায়ক মানব জাতির জ্ঞান এবং ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এই অদৃশ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর সৃষ্টি ও নিযন্ত্রণেও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান। وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ– 'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' (রুম ৩০/২২)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ– 'তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন, তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক' (মুমিনুর ২৩/৭৮)।

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ– وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ– وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ–

আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়? বস্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি' (৯০ বালাদ ৮-১০) অন্যত্র তিনি বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন' (৬৭ মূলক-২)।

বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত অসংখ্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তুর প্রমাণপুঞ্জির মধ্যে উপরোক্ত আলোচনায় মানবজাতির জ্ঞান, অন্তর বা হৃদয়, ভাষা, জীবন-মরণ, প্রভৃতির সৃষ্টিও নিঃসন্দেহে তাৎপর্য বহন করে। এটা সন্দেহাতীত ভাবেই অনস্বীকারর্য যে, যে কোন সৃষ্টবস্তুর উপর একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির বা অতিরিক্ত সৃষ্টির কোন সুযোগ বা জ্ঞান কারো নেই। সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান একমাত্র মহাজ্ঞানবান আল্লাহতা'আলা অবগত আছেন এবং এটা তাঁর নিকট সহজ, তবে মানুষের নিকট ইহাও অসীম ও অনন্ত।

এ অধ্যায়ের আলোচনা মাতৃভাষার পাশেই ধর্ম দৃশ্যত একটি মামুলি বিষয় মনে হলেও, আসলে তা নয়। উপরোক্ত আয়াতে জ্ঞান, অন্তর বা হৃদয়, অন্তঃকরণ ও ভাষার সৃষ্টি বর্হিজগতে দৃশ্যমান আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের মতই বিশাল সৃষ্টি। মানুষের দেহ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা, চোখ, মুখ, কান, নাক, মাথা প্রভৃতি পরোক্ষভাবে জড়পদার্থ কিন্তু এগুলোকে বশীভূত করে সচল রেখেছে উহাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অদৃশ্য জ্ঞান-বুদ্ধি, হৃদয়, ভাষা প্রভৃতি শক্তি সমূহ।

এদিকে জ্ঞান বুদ্ধি, হৃদয়, অন্তঃকরণ, ইচ্ছা, প্রভূতি মুল্যবান শক্তিগুলোর শ্রেষ্ঠাংশ হলো ভাষা বা মাতৃভাষা। এগুলোর কর্ম পরিকল্পনা একযোগে পরিচালিত হয়। এককভাবে এদের কোন কার্যকারিতা নেই। এককভাবে কেউ স্বয়ংসম্পুর্ণও নয়। ভাষার মাধ্যমেই উহাদের নীরব ও সবর বিকাশ বা প্রকাশ সাধিত হয়। অনুরূপভাবে ভাষা বা মাতৃভাষার পৃষ্ঠপোষক জ্ঞান, অন্তকরণ, হৃদয়, ইচ্ছা প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে ভাষা বা মাতৃভাষা এককভাবে অচল। সুতরাং একমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রক্রিয়া বা প্রণালীর মাধ্যমেই এগুলোর সার্বিক সফলতা বা বিফলতা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের মাথার উপর মহাশূন্য, মহাকাশসমূহ, ছায়াপথসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রভৃতি বস্তুগুলো নিয়ে যে দৃশ্যমান মহাব্যাপক নেটওয়ার্ক (Network) গড়ে উঠেছে তা একটি অপরটির পরিপূরক। একইভাবে মানুষ এবং বড় বড় মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে যে জ্ঞান বুদ্ধি, হৃদয়, অন্তঃকরণ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভাষা, মাতৃভাষা প্রভৃতি অদৃশ্যশক্তিগুলো প্রাপ্ত হয় তা ঐ মহাব্যাপক নেটওয়ার্ক (Network) অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ আমাদের অতি পরিচিত এই স্পর্শকাতর অদৃশ্য নেটওয়ার্কের গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

বর্তমান উন্নত বিশ্বে প্রায় চার হাজারেরও বেশী ভাষা বা মাতৃভাষা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর ছয় সাত শো কোটি মানুষ সবাই নিজ দেশে নিজ নিজ মায়ের কোল হতে মাতৃভাষা শিখছে অনায়াসে, অতঃপর উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিদেশী ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা, ধর্মীয় ভাষা শিক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এতে কারো কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু নিজ মাতৃভাষাকে অপছন্দ করে, অন্য ভাষাকে ভাল ভেবে নিজ মাতৃভাষাকে বিসর্জস দিয়ে, অন্য কোন ভাল ভাষাকে অনুসরণ করে না। কারণ ভাষাবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভালভাবেই জানেন, যে কোন ভাষার বা মাতৃভাষার অর্থ, শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ, প্রবাদবাক্য, গল্প, কাহিনী, গদ্য, পদ্য, নভেল, নাটক, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, শত্রুতা, গান, বাজনা, নাচ, আমোদ , প্রমোদ, দুঃখ, বেদনা, হাসি, কান্না, অন্যায়, ন্যায়, সত্য, মিথ্যা, সুবিচার, অবিচার, মানবিক, অমানবিক, শান্তি, অশান্তি, সম্মান, অসম্মান, স্বধর্ম, পরধর্ম প্রভৃতি বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্দেশ্য, মর্মার্য ও ভাবার্থ এক ও অভিন্ন।

অবশ্য আলোচ্য রচনায় মাতৃভাষার পক্ষেই ধর্মের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করছি। সেহেতু আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধর্মগ্রন্থ ও ঐশীগ্রন্থ। মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ এই মহাকিতাবের পটভূমিকায় স্বয়ং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা মাতৃভাষার জ্ঞান বিবেক ও বোধশক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মানবতার সঙ্গে ধর্মকে সংযুক্ত করেছেন। অতঃপর তাঁর নির্বাচিত প্রিয় গৃহ বায়তুল্লাহর দেশবাসী আরবদের মাতৃভাষা আরবীতেই কুরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেন। মহারহস্যবিদ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে সময়ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর মাতৃভাষাও আরবী। সুতরাং মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় দেশ, প্রিয় রাসুল (সাঃ) ও সারা বিশ্বের প্রিয় শ্রেষ্ঠ মানবের মাতৃভাষা আরবীতেই কুরআন অবতীর্ণ করেন।

মূলত : মাতৃভাষা জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোই হলো সকল জ্ঞানের ও বোধশক্তির উৎস। এ বিষয়ের মহাজ্ঞাতা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তা খুব ভালভাবেই জানেন। মাতৃভাষা এমন একটি বিষয়, যা পণ্ডিত মহলে খুবই সহজ আবার নিরক্ষর মহলেও কঠিন নয়, মুর্খ সমাজের লোকেরাও অনেক বোঝে। কাজেই পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হলে, উহা সমগ্র আরববাসীর জন্য তা অবশ্যই সহজ হবে এবং উহার ধারক ও বহক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষেও কঠিন হবে না এমন ভাবাবেগ হতেই পবিত্র কুরআন আরবদের মাতৃভাষা আরবীতে নাযিল হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে

শিক্ষার প্রসার ঘটায় পবিত্র কুরআন এখন অনেক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতেও কুরআন অনুবাদ হয়েছে এবং বর্তমান আরও অনেক উন্নত লেখকের মাধ্যমে কুরআন অনুবাদ হচ্ছে অহরহ। ফলে প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারের ঘরে ঘরে কুরআনের অনুবাদ অনুশীলন হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের মূল ভাষা অনুবাদ হওয়ায় ধর্মকে বুঝতে চিনতে শিখতে এবং নিবিড়ভাবে অনুভব করতে যে সূবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্যেই সম্ভব হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ধর্মীয় প্রত্যাদেশ, আদেশ, উপদেশ তো মাতৃভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সত্য ও ন্যায়ের পুনঃ প্রতিধ্বনি। অবশ্য মাতৃভাষার আলোই ধর্মীয় আদর্শেই বিপরীত মিথ্যা ও অন্যায়ের গোপন ষড়যন্ত্র মূলক প্রতিধ্বনিও ভেসে আসে বার বার। কিন্তু আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার আশঙ্কায় বিপরীত প্রক্রিয়াকে পত্যাখ্যান করে যে কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাতৃভাষার আলোকে ধর্মের গভীরে প্রবেশ করায় এ প্রত্যাখ্যান সম্ভব হয়। তাছাড়া এব্যাবস্থা উদ্ভাবনের ফলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষও তার কঠোর অধ্যাবসায়ের দ্বারা বড় বড় আলেমের সমতূল্য ধর্মীর জ্ঞান অর্জন ও বাস্ত বায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন একটি বিশ্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ মানুষের জন্য প্রচারমূলক উপদেশ। এসব উপদেশ উচ্চারিত হয়েছে, সেইসব মানুষের জন্য যারা দৈনন্দিন জীবনে সহজ-সরল ভাষায় অভ্যস্ত। এখানে বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সাধারণ ও সাদাসিধে অনেক উপদেশাবলীও যা মাতৃভাষার সহজতর অংশ। উদাহরণত পবিত্র কুরআনের একটি সহজ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। মহান আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ছাড়া অন্য কারও বাড়ীতে বাসিন্দাদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় যাতে তোমরা সাবধান হও। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদের কে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ সেখানে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ ভাল করেই জানেন। যে বাড়ীতে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর। বিশ্বাসী পুরুষদের বলুন

তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে আর তাদের যৌন অঙ্গকে হেফাজত করে। বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে আর তাদের যৌন অঙ্গ হেফাজত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। তারা যেন নিজের বোনের ছেলে, নিজেদের মেয়েছেলে, তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসী যৌনকামনামুক্ত পুরুষ আর সেই সব ছেলে যাদের নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি তাদেরকে ছাড়া কারও কারও কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সজোরে পা ফেলে না চলে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' (২৮ নুর-২৭-৩১)।

আরও সুন্দর সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণিত প্রত্যাদেশ হলো, 'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুনাময়, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ তার থেকে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা সকল উত্তম নাম তাঁরই আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী' (৫৯ হাশর ২২-২৪)।

মানুষ সামাজিক জীব, জন্মগতভাবে কিছু মানুষ লজ্জাশীল, কিছু লজ্জাহীন, কিছু নম্র, কিছু উগ্র, কিছু ভদ্র, কিছু অভদ্র, কিছু সাধারণ, কিছু অসাধারণ প্রকৃতির হয়ে থাকে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষকে সুশিক্ষা দানের প্রয়াসে তাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে বিধি-বিধান প্রদান করে তাঁর অমূল্য আদেশ অবতীর্ণ করেছেন। এসব আয়াতের দায়ভার মাতৃভাষার মতই একান্ত সবল সহজ, শুধু একটি সুন্দর নিয়ম প্রবর্তনের প্রয়োজনে উপরোক্ত আয়াতের অবতারণা। একজন সুসভ্য মানুষ অপর একজন সুসভ্য মানুষের বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশ করতে চাইলে, উক্ত গৃহকর্তাকে তার উপস্থিতি সংকেত স্বরূপ সালাম, অতঃপর তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি নেওয়াটা কি সর্বোচ্চ ভদ্রোচিত আচরণ নয়? মানুষ কি এর চেয়ে কোন সুন্দর নিয়ম বের করতে পেরেছে বা করেছে? না, বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আল্লাহর উপরোক্ত বিধানকে কেউ কেউ শত ভাগ,

কেউ অর্ধাংশ কেউ কেউ কিয়দাংশ মেনে নিয়েছে পার্থিব জগতের শিষ্টাচার রক্ষার্থে। যেমন মুসলমানদের সালাম, হিন্দুদের আদাব, প্রণাম, অতিভক্তদের সষ্টাঙ্গে প্রণাম, কারও শুভেচ্ছা, কারও good morning কারও good evening প্রভৃতি আল্লাহর আদেশেরই রূপান্তর।

বর্ণিত শেষোক্ত আয়াতগুলোতে মহাপরাক্রশালী মহাক্ষমতাধর আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ একক ইলাহ, একমাত্র বাদশাহ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। ইহজগত ও পরজগতে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এই সহজ ভাষাগুলোও মাতৃভাষার গুরুত্বের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। মানুষের মধ্যে যারা এক আল্লাহর সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন এবং তারা ধীরে ধীরে ধর্মের পথে আকৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ সম্পর্কে কিছু মনে করে না তারা ধীরে ধীরে বিপথগামী হয়ে ধ্বংসের পথে চলে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যারা ধর্মের পথে চলে না, আল্লাহকে মানে না, আল্লাহর ধার্মিক বান্দাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তারাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মহাক্ষমতা, তাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও এককত্বকে স্বীকার করে। পবিত্র কুরআনে এ স্বীকৃতির উদাহরণ রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি তাঁর হাবীব (সাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, "আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে রুযী দান করে তোমাদের আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কে মৃত্যুকে জীবিতের মধ্যে থেকে বের করেন? কে করে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন আপনি বলুন, তারপরেও ভয় করবে না' (১০ ইউনুস-৩১)।

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ' (৪৩ যুখরুখ-৯)।

উপরোক্ত আয়াত কয়টির সরল ও সাধারণ বর্ণনার সহজ অর্থে বোঝা যায়, যারা আল্লাহর বিধানে বিশ্বাস করে না এবং তা মানেও না, তারাও এ মহারাজত্বের মহাআড়ম্বরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই যেন সত্য কথাটি বলে ফেলে। আমার মনে হয় সৃষ্টির পর যুগে যুগে ধর্মদ্রোহী মানুষেরাও ভীত

হতবুদ্ধি হয়ে বড় বড় সৃষ্টির ও কাজের মালিক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে। কিন্তু তাতে তাদের কতটুকু লাভ হবে মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার তা ভাল জানেন।

অবশ্য বর্তমান প্রগতির যুগেও মানুষ সর্বশেষ সম্বল হিসেবে, সর্বমহান আল্লাহকে স্বীকার করে নিচ্ছে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি ও মানুষ। আর মুসলমানদের বিষয়টি তো অনেক স্বতন্ত্র। কারণ পৃথিবীর মুসলমানেরা ধর্ম নিয়ে বা ধর্মপালন নিয়ে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়লেও তাদের মৌলিক কর্তব্যগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ঈমান, সতের রাকাত ফরজ ছালাত, যাকাত ও হজ্জ এগুলোর আদর্শ সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। এতদ্ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত জন্ম, মৃত্যু, আকিকা, খতনা, সদকা, খয়রাত, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কবর, কবর যিয়ারত, দোয়া প্রভৃতি বিষয়গুলোর মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যামন।

তবে এ ক্ষেত্রে বিস্ময়ের বিষয় হলো অনেক মানুষ শুধু ওয়ারিস সূত্রেই মুসলমান দাবী করে, তাদের কার্যকালাপে কথাবার্তায় ইসলামের কোন নমুনা নেই বললেই চলে। এমনকি তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথাও বলে। এ অবস্থায় একসময় তারা অসুস্থ হয়ে শর্য্যাশায়ী হয়ে পড়লে তারা আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর নিকট হতে দোয়া চায়। অতঃপর এদের মৃত্যু হলে যথাযথভাবে ইসলামী নিয়ম-কানুনে কাফন-দাফন করা হয়। পরবর্তী সময়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, আলেম-ওলামাকে নিয়ে বাসায় আড়ম্বরে দোয়া খায়ের ও কুলখানির ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, যারা বড় বড় অপরাধী, সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত, খুনী ব্যাভিচারী, মদ্যপায়ী তাদের মৃত্যু হলেও একইভাবে ইসলামী কায়দায় কাফন-দাফন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর তারাও তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আলেম-ওলামাকে নিয়ে যথারীতি দোআ খায়ের ও কুলখানি করে থাকে। কারণ এরা শেষ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই একমাত্র প্রভু হিসেবে স্বীকার করে থাকে।

পৃথিবীর বড় বড় দেশ ও জাতির ইতিহাসেও দেখা যায়, আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনায় নিহত ভাষা শহীদদের, লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধাদের, বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের শহীদ দিবসে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বিনয়ের সাথে বিশেষ দোআ করার ন্যায়, তারাও তাদের দেশের ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর জন্য ঐ নির্দিষ্ট দিনে স্রষ্টার নিকট শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে অত্যন্ত ভক্তিভরে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করে

থাকে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিতও হয় যে, পবিত্র কুরআনের বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতগুলোর যৌক্তিতা সঠিক।

মানুষ জন্মগতভাবে প্রভুভক্ত। তাই জন্মের পর হতেই মায়ের কাছে ও পরিবারের কাছ হতে প্রভুভক্তের নিদর্শন পেতে থাকে। অতঃপর শেষ পর্যায়ে প্রভু আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনির্ভর করে এবং তাঁর প্রতিই সবকিছু সোপর্দ করে। প্রভূভক্তের এ পর্যায়ে মানুষ ছাত্রজীবনে, চাকুরীজীবনে, ব্যবসায়ী জীবনে, ভ্রমন কাহিনীতে, খেলা-ধুলার জীবনে এক স্রষ্টার সমীপে মঙ্গল কামনা করে। এর জন্য মুসলমানেরা মিলাদ মাহফিল ও দোআ খায়েরের অনুষ্ঠান করে, অনান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাদের স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে তাদের বিধান মত প্রার্থনা করে। তাদের প্রার্থনার যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় মাতৃভাষার অনাবিল উৎস হতে এক ও অভিন্ন মর্মার্থে উৎসারিত।

সর্বমহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসায় দরিদ্রের ভূমিকা অকৃত্রিম বলে মনে হয়। একজন মুসলমান ভিক্ষুককে কেউ দু'টি টাকা দান করলে সে দাতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করে। হিন্দু বা অন্য ধর্মের ভিক্ষুককে দু'টি টাকা দান করলে সেও দাতার জন্য ভগবান বা ঈশ্বেরের কাছে প্রার্থনা করে বা প্রার্থনা সূচক কথা বলে। আবার কোন কারণে ঐ দরিদ্র ভিক্ষুককে দান না করলে বা তার সঙ্গে কেউ অসদাচরণ করলে সে তখনই আল্লাহর বা ভগবানের বা ঈশ্বরের দরবারে প্রতিকার বা বিচারের প্রার্থনা করবে। এমনিভাবে কোন দীন-দরিদ্র, দুর্বল, অসহায়, হতভাগ্যের দল, যখন সবল, ধনী ও অত্যাচরীদের দ্বারা কোন ব্যাপারে নিপিড়ীত হয় তখন মুসলমানেরা আল্লাহর দরবারে, অনান্য ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বর, ভগবান বা god -এর দরবারে বিচার পেশ করে পরকালের শেষ বিচারালয়ে নায্য বিচার পাওয়ার জন্যে। এভাবে মানুষের মধ্যে বহুমুখী ধর্মীয় অনুভূতি মাতৃভাষায় সৃষ্ট অনুভূতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

মাতৃভাষায় ধর্মীয় সুবিধা অসুবিধা

ভাষা বা মাতৃভাষা বিশ্ব নিয়ন্তার এক অন্যতম নিয়ামত বা অবদান। মানুষ ও অনান্য প্রাণীর মধ্যকার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ভাষা। এ ভাষা কত সুন্দর, কত বৈচিত্রময়! এ বিশাল বিশ্বের দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে বহু ভাব ভাষা। একই ভাষায়, একই শব্দেও আছে যেমন বিভিন্ন রূপ, তেমনি আছে বিভিন্ন অর্থ ও মর্ম। কখনও তা ব্যবহৃত হয় মূল অর্থে আবার কখনও রূপক অর্থে। ব্যক্তি স্থান, কাল, এমনকি উচ্চারণ ও আচরণ ভেদেও বিভিন্ন অর্থ হতে পারে বিভিন্ন শব্দের। যার মুখ হতে বের হয় শব্দ কেবলমাত্র সেই সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম উহার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম। কিন্তু অপরে না বুঝলে উহার ব্যাবহারই হয় ব্যর্থ এবং তাতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝতে ও বোঝাতে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই।

যেহেতু মানুষের অন্তর যে কত বৈচিত্র্যময় ও অনন্ত কথার মহাজগত তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এখানে রয়েছে কত জানা-অজানা, ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না, সত্য-মিথ্যা, কল্পনা-বাস্তব, সম্ভব-অসম্ভব, চিত্র-বিচিত্র, প্রকাশ্য-গোপনীয়, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত প্রভৃতি অগণনীয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তবভাণ্ডার। এসব কিছুর মধ্যে সত্য-ন্যায় ও ধর্মের স্থান শীর্ষে এবং এগুলোর উৎসও মাতৃভাষা। অবশ্য আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার এক ও অভিন্ন আদর্শ ও নীতিমালার একমাত্র মুলগ্রন্থ একটা নির্দিষ্ট এলাকার মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হওয়ায় অনেকের নিকট তা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে বর্তমান অত্যাধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে কোন ভাষায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা খুব সামান্যই অনুভূত হয়।

পবিত্র কুরআন নাযিলের ভাষা নিয়ে যে সমালোচনা করা হয়ছে তা কতিপয় মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। এরা সংখ্যায় মোটেও কম নয়। তাদের সংখ্যাধিক্যে আল্লাহর ঈমানদার বান্দাদের মধ্যে দুর্বলতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে বা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে মানব জাতির অবগতির প্রয়াসে, তাদের সংখ্যাধিক্যের আচরণের বিপক্ষে প্রত্যাদেশ দ্বারা মহানবী (সাঃ)-কে তাঁর আদর্শ হতে এবং আল্লাহর সুপথ হতে বিচ্যুত না হওয়ার জন্যে প্রত্যাদেশ করেন যে, "আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও

সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়, তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন যারা তাঁর পথে অনুগমন করে' (৬ আনআম ১১৫-১১৭)।' মাতৃভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের সরল, সহজ ও একান্ত প্রয়োজনীয় আয়াতগুলোর উদাহরণ বহু আয়াতে বিদ্যামন।

এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, যিনি মাতৃভাষার স্রষ্টা তিনিই উহার শ্রেষ্ঠত্ব দানকারী একমাত্র সত্তা। আরবদের ভাষা বা মাতৃভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার নেপথ্যে বা অন্তরালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তা হলো সর্বমহান আল্লাহ তা'আলা ও আমাদের বিশ্ববাসীর সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় মানবটির সম্মান, তাঁর ও তাঁর দেশবাসীর ভাষার ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রদান করা। অবশ্য এতে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আরবী ভাষাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষা, যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হয়তো একথা মেনে নিবে না। কিন্তু আল্লাহ তো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং মঙ্গলের জন্যেই তা করেন।

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল মুসলমানদের জন্যে প্রতিবন্ধকতা নয়, কারণ মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। কাজেই আরবী ভাষায় কুরআন বুঝতে অসুবিধা থাকলেও আল্লাহর প্রেরিত সুসংবাদ হিসাবে উহাকে মুসলমানরা সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে। অতঃপর যখন উহা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে তখন কল্পনাতীতভাবেই উহার বিষয় বস্তুকে সহজ ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পৃক্ত দেখা যায়। তবে কুরআনের বাণীর মধ্যে যে জটিলতা নেই তা নয়, জটিলতা অবশ্যই আছে, যার সমাধান মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। এ জটিল বিষয়গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। এই রহস্যময় বিষয়সমূহ ও বাণীসমূহের অজ্ঞাত গুরুত্বের প্রতি মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসস্থাপন ও ঈমানদার বান্দার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত এই জটিল বা অবোধগম্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা, অনুধাবন করা বা কোন প্রকার গবেষণা করা হতে বিরত

থাকার জন্যও আহ্বান জানান হয়েছে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের। কাজেই কুরআনের কঠিন ও জটিল শব্দগুলো, বাক্যগুলো, আয়াতগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তার কিছু নেই বরং সহজ বাক্যগুলো, নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বা সেগুলোর পাঠ করার আহ্বান জানান হয়েছে (বার বার) পবিত্র কুরআনে বিশাল কলেবরে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً– إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً–

আপনি কুরআন আবৃত্তি করুণ ধীরে ধীরে ও সুন্দরভাবে, আমি আপনার কাছে এক গুরুত্বপর্ণ বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি' (৭৩ মুজ্জামিল ৪, ৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ–

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াত সমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে' (৩৮ ছোয়াদ-২৯)।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً–

'আমি তো আপনার ভাষায় এ কুরআন সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি তার দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারেন' (১৯ মরিয়ম ৯৭)।

একই মমার্থের অন্য এক প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে, "এভাবে আমি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর এর মধ্যে বিশদভাবে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি যাতে ওরা ভয় করে বা স্মরন করে। উপরে আল্লাহ মালিক সত্য। আপনার উপর আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরআন পড়তে তাড়াতাড়ী করবেন না। আর বলুন, হে আমার প্রতিপালকা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন' (২০ তোয়ারা ১১৩-১১৪)।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কেন্দ্রস্থল আরবদের মাতৃভাষায় (আরবীতে) কুরআন নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটের মহান আল্লাহ তা'আলা মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 'উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছে। কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে' (৫৪ কামার ৩২)

কুরআনের সপক্ষে আরও আকর্ষণীয় বাণী হলো, 'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসম্বলিত এমন এক কিতাব যাতে একই কথা নানভাবে বার বার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপ্রালককে ভয় করে তাদের দেহ এতে রোমাঞ্চিত হয় তারপর তাদের দেহ ও মন প্রশস্ত হয়ে আল্লাহর স্মরনে ঝুকে পড়ে। এ-ই আল্লাহর পথনির্দেশ । তিনি যাকে ইচ্ছা এদিয়ে পথপ্রদর্শন করেন আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই' (৩৯ যুমার-২৩)।

ধর্মের বিষয়কে চিরদিনের জন্য চির উন্নত ও সুবিধাজনক দৃঢ় অবস্থানে অধিষ্টিত করার মহান পরিকল্পনায় ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু মক্কাবাসীদের মাতৃভাষা আরবীতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। অবশ্য এতে প্রত্যক্ষভাবে আরবদের কিছু সুবিধার কথা বলা থাকলেও কুরআনে বিশদ বর্ণনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর মানবতার কথা, মহানুভবতার কথা, মহত্ত্বের কথা নিরপেক্ষতার কথা, উহার শ্রেষ্ঠত্বকে উচ্চাসনের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। পবিত্র কুরআনের সরল-সহজ বর্ণনায় আরব ও অনারবদের সুযোগ-সুবিধায় কোন প্রকারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিরুপিত হয়নি।

বরং উহার বর্ণনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক নিরপেক্ষ পরম শান্তির দিক নির্দেশনা সংরক্ষিপ্ত রয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে, পবিত্রতার আলোকে, সত্যের আলোকে নিরীক্ষণ করলে প্রত্যেকে আজ ধর্মকে বা ইসলাম ধর্মকে নিজ ভাষায় সর্বদাই নিজের সাথেই দেখতে পাবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলো নিয়ে বর্ণিত উপরের আয়াতগুলিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপরের আয়াতগুলোর দ্বারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যে কোন বিষয় বস্তুকে স্বাভাবিক সরল সহজ ভাষায় উপদেশ ও সুসংবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার বর্ণনায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের সত্য সুসংবাদ বেরিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে পাশাপাশি বর্ণনায় অস্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত বিচারের ও শাস্তির কথাও প্রকাশিত হয়েছে একইভাবে। এখানে সার্বিক ও সার্বজনীনভাবে তেমন কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে

বোধ শক্তির অভাবে সামান্য বিষয় নিয়েই কিছু লোকের বেশ অসুবিধা হয়। অতঃপর আল্লাহভীতির কারণে তা সুবিধায় রূপান্তরিত হয়। যেমন ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাক্য لَآاِلٰه اِلَّا اللّٰه 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই'। আসলে এটা একটু বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় লা ইলাহা, নেই কোন উপাস্য। ইল্লাল্লাহ 'আল্লাহ ব্যতীত'।

এ গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ অনেক। তবে উপরোক্ত ছোট্ট অর্থটুকু অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুধাবন করতে হবে প্রতিটি মুসলিমকে। কারণ ইসলাম ধর্মের জন্য বা ধর্ম পালনের জন্য এই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাক্যকে অকৃতিমভাবে গ্রহণ করা ও অনুসরণ করা হলো সর্বপ্রথম অনুশীলন। অথচ এ বাক্যটি আমাদের মাতৃভাষায় না হওয়ায় অনেক নিরক্ষর ও অসচেতন মানুষের কাছে এখনও উহার অর্থ পরিস্কার নয়।

ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) তাঁর পিতা (মুসাইয়াব) থেকে বর্ণনা করেন, আবু তালিবের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো নবী (সাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন আবু জেহেল তাঁর কাছে বসা ছিল। নবী (সাঃ) (আবু তালেবকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে চাচাজান! শুধু লা-'ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমাটি একবার বলুন। যাতে আমি আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি। তখন আবুজেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, (হে আবু তালিব)! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে? তারা দু'জনে তাকে বরাবর একথাটি বলতে থাকে। অবশেষে তাদের সাথে আবু তালিব সর্বশেষ যে কথাটি বললো, তাহলো আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের অনুসারী হয়ে মৃত্যুবরণ করছি। তখন নবী (সাঃ) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো, যে পর্যন্ত আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা না হয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো 'নবী ও মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়, যদিও তারা (সম্পর্কের দিক থেকে) তাদের নিকটাত্মীয়ও হয়। (বিশেষ করে) যখন তাদের কাছে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, তারা দোযখের অধিবাসী'। আরো অবতীর্ণ হলো হে নবী।' আপনি যাকে চাইবেন, তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না' (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত আল্লাহদ্রোহী আবু জেহেল, আবু উমাইয়া সহ তৎকালীন মক্কার নেতারাই পবিত্র কুরআনের সত্যবাণীর কথা জানত বুঝত

ও মনে মনে স্বীকার করতো। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে যোগ দেওয়ায় তাদের অনেকে আল্লাহর রহমত হতে চিরবঞ্চিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্টই থেকে গিয়েছিল। মাতৃভাষার স্বচ্ছ, সুন্দর ও অনাবিল মর্মবাণী তাদের হৃদয়ে সত্যের দাগ টানতে পারেনি। তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভীতি প্রবেশ করেনি। কাজেই মাতৃভাষায় কুরআন পেয়েও তারা মহাক্ষতিগ্রস্ত, হতভাগ্যদের দলেই থেকে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে নবী পূর্ব যুগের অনেক পাপী যাদের কুরআনের জ্ঞান ছিল না, আল্লাহভীতির কারণে নিজেদের গৃহীত পদক্ষেপ বা কার্যক্রমের ফলে আল্লাহর রহমত লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের পাপের নিস্কৃতি পেয়েছে।

উদাহরণত একটি হাদীস আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর পূববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। তার মৃত্যুর সময় যখন নিকটবর্তী হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা উত্তর দিল যে (আপনি আমাদের) উত্তম পিতা। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট কোন নেকী সঞ্চয় করিনি (কাতদাহ 'লাম ইয়াব তায়িব' অর্থ বলেছেন জমা করনি)। এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন। কাজেই তোমরা লক্ষ্য রেখো। যখন আমি মরে যাব, তখন আমাকে জ্বালিয়ে কয়লা করে চূর্ণ করে ফেলবে। তারপর যখন জোরে বাতাস বইবে তখন চূর্ণগুলি বাতসে ছড়িয়ে দিবে। তারা (তার সন্তানেরা) এ কথার উপর অঙ্গীকার করল। আল্লাহর কসম। তারা তাই করল। অতঃপর আল্লাহ বললেন; হয়ে যাও আর সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো। আল্লাহ বললেন হে আমার বান্দা! তোমাকে এ কাজে কিসে উৎসাহিত করেছে? সেউত্তর দিল, আমি আপনার ভয়েই একাজ করেছি। অতঃপর আল্লাহ তার উপর দয়া করলেন (ক্ষমা করে)' (বুখারী)।

আলোচ্য অধ্যায়ে মাতৃভাষার ধর্মীয় সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনায় পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলোর বঙ্গনুবাদ উপস্থাপন করেছি, তা বোঝার জন্য আরবদের-অনারদের ও আমাদের বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে তেমন পার্থক্য মনে হয় না। তবে আসল পার্থক্য হলো আরবরা অর্থাৎ সেখানকার পণ্ডিত ও নিরক্ষর সকলের সামনে কুরআনের যে কোন অংশপাঠ করলে তার সরল-সহজ অর্থ সবাই কম-বেশী বুঝবে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশী পণ্ডিত ও নিরক্ষরদের সম্মুখে পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করলে শুধু

আরবী ভাষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ বুঝবেন নিরক্ষর ও সাধারণ পণ্ডিতগণ কিছুই বুঝবেন না। আর সেজন্যেই ধর্মপালনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত এর অভ্যন্তরস্থ আরবী অনুশীলনগুলো বোঝার ক্ষেত্রে আরবদের চেয়ে অনারবরা পশ্চাৎপদ। এ বিষয়ে কয়েকটি তসবীহ্ পাঠ নিয়ে ও উহার মর্মার্থের ও অর্থের তারতম্য নিয়ে (উপরে) সামান্য আলোচনা করেছি।

তবে প্রকৃত ধর্মপালনের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই। এখানে অকৃত্রিমভাবে ধর্মীয় বিষয়কে অনুধাবন না করলে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কখনও সম্ভব হবে না। মাতৃভাষায় ধর্মকে তথা ধর্মের সত্যতাকে জানার পরও আবু জেহেল, আবু উমাইয়ার দল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তারা তাদের প্রাচীন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পক্ষান্তরে নবী (সাঃ) এর পূর্ব যুগের মানুষ তাদের আন্তরিক ভাবাবেগ হতে আল্লহর অস্তিত্বকে ভীতি সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তার সেই পবিত্র মানসিকতা তাকে বিপজ্জনক অবস্থা হতে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে যারা পবিত্র ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাাহর পানে অগ্রসর হয় এবং আত্মসমর্পন করে তাদেরকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। এ ধরনের প্রকৃত আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিদের অনুকূলে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশ করেন যে, যে দিবসে ধন সম্পদ নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে (সে মুক্তি পাবে)।' (২৬ শো তারা ৮৮, ৮৯)।

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের ধর্মীয় জীবন গড়ে ওঠে। তবে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় মাতৃভাষার অপরিসীম অবদান অনস্বীকার্য।

সঠিকভাবে ধর্ম-কর্ম পালনে মাতৃভাষার অবদান

সঠিকভাবে ধর্মকর্ম পালনে মাতৃভাষার অবদান শীর্ষক আলোচনায় মাতৃভাষাকে ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করতে চেয়েছি, অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সারা জীবনের কোন অত্যাবশ্যকীয় বা উন্নয়নমূলক কাজকে বাদ দিয়ে ধর্মের কাজকে সেখানে ঢোকাতে হবে। জাগতিক কাজের কোন সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নেই, যদিও আমরা তা মনে করি। আমাদের মনের এই ধারণা ক্রটিমুক্ত নয়। কারণ বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে আমরা সকল পেশার লোকেরা কর্মজীবনে একটি মোটামুটি কর্মসূচীর উপর (২৪ ঘণ্টা) দিনরাত্রি অতিক্রম করি। এই সব কর্মসূচীতে কর্মের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে না, আর থাকলেও তা কম-বেশী হয়ে যায়, তখন করার কিছু থাকে না। ধরুন একজন কর্মকর্তা বাড়ী হতে বের হয়েছেন, পথিমধ্যে তার গাড়িটার ক্রটি দেখা দিল বা অন্য কোন কারণে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে ১৫ মিনিট দেরী হয়ে গেল। অফিসে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সময় এক বিশেষ অতিথী এসে হাজির হলেন, তার সাথে আলাপ করতে করতে ২০/২৫ মিনিট বা এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। আবার কোন সময় বাড়ী হতে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে টেলিফোন বা মোবাইলও আসে। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু নতুন সমস্যা আসে যা তার কর্মসূচীতে বা চিন্তায় ছিল না। এত কিছু সমাধান হয়, কিন্তু ধর্মের বিষয়টি অনেকেরই কর্মসূচীতে থাকে না। এভাবে সারাদিনের কর্মকাণ্ডের হিসাব করলে সন্তোষজনক কোন হিসাব পাওয়া যাবে না।

আসলে ধর্মীয় জীবন বলতে পৃথক কোন জীবন নেই এবং শুধু কর্মজীবন ও কোন জীবন নয়। শুধু আল্লাহর আদেশ ধর্ম ও কর্মের মহামিলনেই প্রকৃত জীবন গড়ে ওঠে। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কর্ম ও ফাঁকে ফাঁকে ধর্ম, কর্মের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই ও সময় নেই। কিন্তু ধর্মের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও সময় আছে। কোন কর্মের সময় তা (কিছুক্ষণ) স্থগিত রেখে ধর্ম পালন করা যায়, কিন্তু ধর্মের সময় কর্ম করা যায় না। অবশ্য কর্মের সময়ের তুলনায় ধর্মের সময় ব্যয় হয় খুব সামান্য। কর্মজীবনের আসল কর্ম বাদ দিয়ে অতিরিক্ত যে কাজগুলো করা হয়, ধর্মের কাজটুকুকে অতিরিক্ত সময়ের অতিরিক্ত কাজও মনে করা হয় তাতেও ক্ষতি নেই। বরং (ধর্ম) পালন করছি এ বিশ্বাসই যথেষ্ট। অবশ্য কর্মের মত ধর্মকেও অনেকে ভালবাসে–অর্থাৎ

কর্ম করতেও ভালবাসে, ধর্ম করতেও ভালবাসে। তাছাড়া ধর্মীয় বিধানেও ধর্মকে বাদ দিয়ে কর্ম করার বা কর্মকে বাদ দিয়ে শুধু ধর্ম করার কোন নির্দেশ নেই। উভয়কে ধারাবাহিকভাবে পাশা-পাশি চালিয়ে যাওয়াটাই আল্লাহর বিধান।

যারা ধর্ম পালনে অবহেলা করে বা ধর্মপালন করতে চায় না, তারা যদি এক ঘন্টা চোখ বন্ধ করে দুনিয়াটাকে বা দুনিয়ার কাজ কর্মকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তবে দুনিয়ার কাজ-কর্মে কোন শাপ্তি বা প্রশান্তি খুঁজে পাবে না। বরং ধর্মের কাজে আন্তরিক ও মানসিক প্রশান্তি পাবে। মাতৃভাষার দাবী শুধু মাতৃভাষায় কথা বলা নয়, স্বেচ্ছাচারিতা করা নয়, অবৈধ অর্থ উপার্জন নয়, অবৈধ প্রেমপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, ধর্মের প্রতি অসচেতনতা প্রদর্শন ইত্যাদি বন্ধ করা। মাতৃভাষার দাবী সত্য ও ন্যায়ের দাবী এবং মাতৃভাষার উৎস একান্ত পবিত্র ও স্বচ্ছ, তবে উহার প্রবাহ বৈচিত্র্যময়।

মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মকে এত কাছে পেয়েও অবজ্ঞা করা আমাদের জন্য মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। কারণ আমরা তো ধর্মের সঙ্গে আমরণ জড়িত। মানুষ জীবনের শেষে ধর্মের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দুনিয়ার সব কাজ হতে অব্যাহতি দিয়ে ধর্মের তথা আল্লাহর পথে উপযুক্ত পরিবেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তার (মৃত ব্যক্তির) আত্মার শান্তির জন্য, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শী, এলাকাবাসী ও দূরদূরান্তরের হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে দোআ-দরূদ পাঠ করে। মানব জীবনের এই শেষ অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক এবং শতভাগই তা বাস্তবায়িত হয় সন্দেহাতীত ভাবেই। পক্ষান্তরে জীবনের কিশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের সুখময় জীবনেও ধর্ম সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কতভাগ পালিত হয় তা বলা খুবই মুশকিল। কারণ এখানে শতভাগ তো বাস্তবায়িত হয়ই না, যা হয় তা খুবই সামান্য।

কিন্তু ধর্মের প্রতি এই অনিহা সভ্য ও সুশীল সমাজের জন্য কাম্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা ও অনুকূল পরিবেশ দান করেছেন। অতঃপর নিজ ভাষায় (মাতৃভাষায়) ধর্মকে সুচারুরূপে বোঝার সুযোগও করে দিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে নানা ধরনের কাজ করার অনুপ্রেরণাও দান করেছেন। ধর্মীয় অনুশীলনের মাধ্যম আরবী ভাষা হলেও, এখন আরবী ভাষা ছাড়াও ধর্ম নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হচ্ছে। কারণ প্রতিটি মুসলিম দেশ তাদের নিজেদের

ভাষায় বা মাতৃভাষায় কুরআনের অনুবাদ করে নিয়ে ধর্মের সহজ ও প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর তাৎপর্য অনুসন্ধান করছে। আমাদের বাংলাদেশেও অনুরূপ গবেষণা চলছে। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা অনুপাতে তা একান্ত অপ্রতুল। বিশেষ করে দেশের বিত্তশালীরা অধিকাংশই তাদের সম্পদের বৈধতার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। মনে হয় কিছু সংখ্যক বিত্তশালী যদি তাদের সম্পদে গরীবদের হক আছে বা ভাগ আছে বলে বিশ্বাস করত, তবে তাদের আর্থিক ফল-ফলাদি ও ফসলাদির উৎপাদন বেড়ে যেত এবং পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কমে যেত।

ধনীর সম্পদে ও শষ্যক্ষেত্রে গরীবদের (ফকির-মিসকীনদের) অধিকার কত মজবুত এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কত ভালবাসেন তা বিশ্ববাসীকে দেখাবার ও বোঝাবার জন্য, গরীবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এক বাগানওয়ালার বাগানের পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের। যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ না বলে। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো, যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্ন-ভিন্ন তৃণসম। সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফসল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। অতঃপর তারা চলল ফিস ফিস করে কথা বলতে বলতে, অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হলো। অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল, আমরা তো পথ ভুলে গেছি। বরং আমরা তো কপাল পোড়া। তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনো তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? তারা বলল, আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘণকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা বলল, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা ছিলাম সীমালংঘণকারী। সম্ভবত: আমাদের পালনকর্তা উহার পরিবর্তে একটি উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী। শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুত্বর যদি তারা জানতো' (৬৮ কলম ১৭-৩৩)।

পবিত্র কুরআনের অপর এক উদাহরণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু'টিকে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি। আর দু'এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। সে ফল পেল, অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল, আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল, তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে। কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না, আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে আনতে পারবে না। অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হলো না এবং সে নিজের প্রতিকার করতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তাঁরই পুরস্কার উত্তম এবং তাঁরই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। তাদের কাছে পার্থিব জীবনে উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়। এরপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যেন, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এসব কিছুর উপর

শক্তিমান। ধনৈশ্বর্যও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি এবং আশালাভের জন্য উত্তম' (১৮কাহফ ৩২−৪৬)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ ঐ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ফল ফসলাদি ধ্বংসের ইতিহাস আবহমান কালের। পবিত্র কুরআনে উদাহরণস্বরূপই বেশ কয়েক জায়গায় ফল-ফসলাদি ধ্বংসের কাহিনী আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐ ধরণের (কিছু পরিবর্তিত) ধ্বংসকাহিনীর জের আজও বন্ধ হয়নি এবং আগমীতে বন্ধ হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের ছোট্ট দেশ বাংলাদেশে ফসল মৌসুমে বিশেষ করে ইরি বোরো মওসুমে প্রায় সারা দেশে পর্যাপ্ত ধান আবাদ হয়। এ সময় (বৈশাখ−জ্যৈষ্ঠ) প্রায় মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ উঠে এবং কোন কোন এলাকায় তা ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। সেই (নির্দিষ্ট) অঞ্চলের মারাত্মক ক্ষতি করে। আশ্চর্যের বিষয় এই ঝড় বা টর্নেডো আকারের দুর্যোগটি একটা সুনির্দিষ্ট এলাকায় এমনকি মাত্র দু'একটি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ভাবে আঘাত হানে এবং সেই এলাকাটুকুরই ফসলাদি ধ্বংস করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অক্ষত থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছি। তাহলো গত ইরি-বোরে মওসুমের আগের মওসুমে (২০০৫ ইং সালে) আমাদের নিজ ইউনিয়নে অনুরূপ এক মাঝাড়ি ধরনের টর্নোডো প্রবাহিত হয়। তাতে মাত্র দুই-তিন কিলোমিটার এলাকার ফসল সাংঘাতিক ক্ষতিগস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মূল অংশের ক্ষেতের ফসল বা ধান প্রায় ৮০% বা ৯০% মত ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শেষ সীমায় অবস্থিত জমিগুলোতে ক্ষতির পরিমান ১০% হবে। এ ধরনের দুর্যোগের তাৎপর্য সবশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে যারা উপরোক্ত বাগানওয়ালার মত অহংকারে লিপ্ত তারাই শুধু অনুভব করবে।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে বহু জনপদ ধ্বংসের করুন কাহিনীও পবিত্র কুরআনে ব্যাপক কলেবরে বর্ণিত হয়েছে। ঐসব জনপদের অধিবাসীরা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে তাদের কল্পিত দেব-দেবীর পুজা করত এবং স্বাধীনভাবে অনান্য শেরেকও করত। তারা তাদের রসূলকে অমান্য করত এবং আল্লাহকে ভয় করত না। তাই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে

আল্লাহতা'আলা তাদের কে ধ্বংস করে দেন। বিষয়গুলো উম্মতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালংঘন করেছিল। স্পষ্ঠ নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারপর তোমরা কি কর তা দেখার জন্য আমি তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছি' (ইউনুস -১৩, ১৪)।

অন্যত্র মহা প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, "তারপর আমি সেই সম্প্রদায়কে (বনী ইসরাইলকে) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। আর নূহের সম্প্রাদয় যখন রাসূলদের উপর মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি ওদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ও ওদেরকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন করে রাখলাম। সীমাংলঘনকারীদের জন্য আমি নিদারুন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি আদ, সামুদ, রসবাসী ও ওদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছিলাম। আমি ওদের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দিয়ে সতর্ক করেছিলাম। আর ওদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছি। অবিশ্বাসীরা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর শাস্তি নেমেছিল, তবু কি ওরা তা দেখে না? নাকি ওরা পুনরুত্থানে ভয় করে না' (২৫ ফুরকান-৩৬-৪০)।

উপরোক্ত ধ্বংস কাহিনীগুলো প্রায় চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতে তারা ছিল আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী সম্প্রাদায়। তাদের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যাভিচার সহ অবর্ণনীয় অপরাধের ফলে নবী-রাসূলগণের প্রার্থনায় ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে ঐসব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন বিচিত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। অতঃপর দেড় হাজার বছর আগে শেষ ও শ্রেষ্ঠ মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রাচীন বর্বর অত্যাচারের ও উহার পরিণতির বিষয়গুলো অবহিত করা হয়। উপরোক্ত আয়াত গুলোতে উদাহরণস্বরূপ সামান্য উল্লেখ করা হলো মাত্র।

ঐসব ধ্বংসকাহিনীর জের হিসেবে আজও দুনিয়ার বুকে ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস সুনামী, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নোডো, হ্যারিকেন, বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমগ্র বিশ্বে বিগত একশো বছরে

প্রায় ১৫/১৬ টি বড় বড় সুনামী, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প প্রভৃতি সংঘটিত হয়েছে। সেগুলোর প্রতিটিতে নিম্নে পঞ্চাশ হাজার হতে ঊর্ধ্বে আড়াই লক্ষ পর্যন্ত লোক নিহত হয়েছে। সর্বশেষে যে ভয়াবহ প্রলয়ংকরী সুমানী নামের প্রাকৃতিক দুর্যোগটি প্রবাহিত হয়েছে। তাতে প্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। বিগত ২৬ শে ডিসেম্বর ২০০৪ইং সালে এই সুনামী ইন্দোনেশিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে, যার ধ্বংসলীলা পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এর পর এক বছর পূর্ণ না হতেই আর একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে পাকিস্তানের কাশ্মীর আঞ্চলে। বিগত ৮ই অক্টোবর ২০০৫ ইং সালের ঐ ঐতিহাসিক ভূমিকম্পে প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী লোক নিহত হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল লক্ষাধিক। এইসব সুনামী ও ভূমিকম্প বা পূর্বোক্ত অবিস্মরণীয় দুর্যোগ সমূহের নেপথ্য কাহিনী একমাত্র এর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকই ভাল জানেন।

আমাদের বাংলাদেশে এরূপ ছোট-বড় দূর্যোগ হয়েই থাকে, ইতোমধ্যে কিছু উল্লেখ করেছি সেগুলো তাদের নিকট কিয়ামত তুল্য। কিন্তু উপরোক্ত ভূমিকম্প, সুনামীর তুলনায় তুচ্ছ। সদ্য সমাপ্ত চট্টগ্রামের ভয়াবহ ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিধ্বসে (পাহাড় ধ্বস) এ পর্যন্ত প্রায় ১২৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে (১৭ই জন/ ২০০৭ইং) এবং আহত হয়েছে শত শত মানুষ।

অপর একটি উদাহরণ বিগত ১৪ এপ্রিল ২০০৪ইং বুধবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাওয়া স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নোডোতে কম পক্ষে ৬২ জন নিহত ও ৪ (চার) সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং পাঁচ হাজার বাড়ীঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় ৫০ কোটি টাকায় উপরে। খবরে প্রকাশ গত ১৪ এপ্রিল ২০০৪ইং সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় টর্নোডো আঘাত হানে। টর্নোডোর ভয়াবহ ছোবলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গাজীর ভিটা ইউনিয়ন ও আশ-পাশ এলাকার পাঁচটি গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এতে ২২ জন নিহত এবং দুই সহস্রাধীক ব্যক্তি আহত হয়। গ্রামগুলির শত শত বাড়ীঘর ও গাছপালা নষ্ট হয়। এমনকি পুকুরের মাছ ডাঙ্গায় উঠে যায়।

এদিকে একই সময় নেত্রকোনায় ভয়াবহ ও প্রলয়ংকরী টর্নোডো জেলার সদর ও পূর্বধলা উপজেলার ২৩ টি গ্রাম লণ্ডভণ্ড করে দেয়। হাজার হাজার বসতবাড়ী মাটির সাথে মিশে যায়। কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়, আহত হয়

প্রায় দুই সহস্রাধিক। এসব গ্রামের বড়ীঘর বলতে কিছুই নেই। গাছপালা, স্কুল, মাদ্ররাসা, ঘরবাড়ী সবকিছুই মাটির সাথে মিশে যায়।

উপরোক্ত ছোট ছোট ঘটনা ছাড়াও বিগত ১৯৭০ সালে উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দু'লক্ষের বেশী লোক মর্মান্তিক ভাবে প্রাণ হারায়। সুতরাং আমাদের দেশেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধারাবাহিকতা চলেই আসছে। শুধু চিন্তা ও গবেষণার অভাব।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের আলোচনা দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের মূল লক্ষ্যকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি। কারণ বর্তমান যে কোন প্রাকৃতিক বা গায়েবী দুর্যোগ সমূহের আবির্ভাব ঘটছে, সেগুলো সমস্তই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রাচীন কালের ভয়াবহ ও অকল্পনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচীনকালের ঐসব আসমানী অতর্কিত গযবে যে জ্বালাময়ী বেদনা ও যন্ত্রণা ছিল (মনে হয়) বর্তমানের গযবগুলো হতে তা অনেক অনেক বেশী মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ও যন্ত্রণাদায়ক। কারণ সেগুলো ছিল প্রকাশ্য মহাক্ষমতাবান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে একটি অহংকারী, সীমালংঘনকারী, অবাধ্য ও চ্যালেঞ্জ করা নির্ভীক পশুপ্রবৃত্তির দল, উপদল ও সম্প্রদায়। তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের প্রতি কঠোর আদেশ ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার। আর সেইগুলির বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে কুরআনে বর্তমান সজাগ শিক্ষিত সমাজের লোকদের মধ্যে চিন্তা ও ভীতি প্রদর্শন এবং সংশোধনের জন্য।

পবিত্র কুরআনের ঐসব বর্ণনা আরবদের মাতৃভাষা আরবীতে বর্ণিত হয়েছে এবং তার (বাংলায়) অনুবাদ পড়ে আমরাও অবগত হয়েছি বা হচ্ছি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো ঐসব মারাত্মক অপরাধের বিনিময়ে মারাত্মক শাস্তির কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তার পরবর্তীকালে যে সব আলৌকিক আসমানী ও যমীনি গযব নিপতিত হচ্ছে তার কোন দলীল নেই। তবে পূর্বকালের ঐতিহাসিক এসব উল্লেখযোগ্য ও দলীলভুক্ত গযবগুলোর পূর্বকালের অসামান্য ভয়ঙ্কর মূর্তির ধারাবাহিকতার সামান্য অংশ, উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ নিঃসন্দেহে পৃথিবী একটি নিয়মের রাজত্ব। যার ফলে সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো, বায়ু প্রভৃতি একই নিয়মে কর্মরত আছে, বিশ্বের সকল উদ্ভিদ রাজিও নিয়মের বাধ্যবাধকতায় সময়মত ফলদান করছে।

সুতরাং জীবনের কর্মক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে যে কোন অজুহাতই দাড় করি না কেন, তা মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অগোচরে নয় এবং তা অজানাও নয়, তিনি অন্তর্যামী। এটা স্বতঃ সিদ্ধ যে পৃথিবীতে কেউ কেউ ধন-সম্পদ আহরণের গবেষণায় একচেটিয়া অংশগ্রহণ করে ধর্মকে জটিলতার অধ্যায়ে ফেলে স্থগিত করে রাখে। অথচ ঐ একই ব্যক্তি যদি ধন-সম্পদ আহরণের সদ্বিচ্ছার মত ধর্মীর জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করত তবে ধনসম্পদ আহরণের মত ধর্মীয় জ্ঞান ভাণ্ডার পেয়ে যেত। কারণ ভাষার জটিলতা কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। যেমন প্রাচীন যুগের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো যতই মর্মান্তিক দুর্যোগে যাতনাদয়ক হোকনা কেন আমাদের সদ্য ঘটিত চট্টগ্রামের দুর্যোগ যাতনাও তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র হালকা বলে আমাদের মনে হয় না। অনুরূপভাবে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানের উৎসস্থলে যতই জটিলতা থাকুক না কেন মাতৃভাষায় ধর্মীয় জ্ঞান লাভের সুযোগকে অন্যদিকে প্রবাহিত না করে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলে আনায়সে তা সহজলভ্য হবে।

পাপ ও পূণ্যের উৎস মাতৃভাষা

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার তাঁর অসীম ও অনন্ত মহারাজত্বের মাঝে তাঁর মহাজ্ঞানের নমুনা স্বরূপ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুসামগ্রীর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম আকৃতিও। এই সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সামগ্রীর সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না এবং কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তাঁর অসীম রাজত্বের আয়তন ও সীমারেখা যেমন কল্পনাতীত তদ্রূপ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্বর্তী বস্তুসমূহের সংখ্যা নির্ণয়ও অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, 'যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর শেষ করতে পারবে না' (১৬ নহল ১৮)। আল্লাহর এই অপরিবতর্নীয় বাণীর প্রতি অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি ও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানপিপাসু হওয়ায় বহু সৃষ্টবস্তুর উপর জরিপ চালিয়ে জ্ঞানার্জনের প্রয়াসে কিছু সত্য তথ্য বের করার প্রচেষ্টা চালায়। যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ় জরিপ চালিয়ে প্রায় চারলক্ষ জাতের উদ্ভিদের সন্ধান লাভ করেছেন।

মানব জাতির জন্য অগণিত নেয়ামত রাজির অধিকাংশই দৃশ্যবস্তু এবং কিছু অতি মূল্যবান অদৃশ্যবস্তুও রয়েছে। এইসব অদৃশ্যবস্তু সমূহের মধ্যে পূণ্য ও পাপ দু'টি অজ্ঞাঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর সর্বত্রই অর্থাৎ জলেস্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্বত্রই পূণ্যের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ মান এবং প্রকাশ্য পূণ্য অর্জনের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ রয়েছে। এই আদেশ অমান্য করলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে বা যথাসময়ে পালন না করলে পূণ্য সঞ্চিত হয় না; বরং পাপ সঞ্চয় হয়ে যায়। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিকূল পরিবেশের দ্বারা বেষ্ঠিত। তাই সরাসরি প্রকাশ্য পাপের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু গোপন পাপের পরিসর খুবই বিস্তৃত ও কল্পনাতীত, এটা প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন এবং অসম্ভবও বটে। অবশ্য পাপের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দিতামূলক ভাবে পূণ্যের গোপন নিরাপদ আস্তানাও আছে, যা একেবারে গুরুত্বহীন নয় বরং উহা গোপন পাপের সমুদয় আস্তানাকে ধ্বংস করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

মানব [হযরত আদম (আঃ)]-কে সৃষ্টির প্রাক্কালে পূণ্য ও পাপ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল না। সে সময় পাপের উদ্ভাবক ও পথ প্রদর্শক ইবলীস

হযরত আদম (আঃ) এর সম্মাননায় ঈর্ষান্বিত হয়ে মানুষের সাথে শত্রুতা করার জন্যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। ফেরেশতাদের সঙ্গে হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করেনি। ইবলীসের সেই ঔদ্ধত্যপনায় চরম অসন্তুষ্ট হয়ে মহাক্ষমতাশালী আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশত হতে বহিষ্কার করেন। অতঃপর অভিশপ্ত অবস্থায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ইত্যঃবসরে ইবলীস হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী হযরত হাওয়াকে প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে সমর্থ হয়েছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-কেও দোষী সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবিনশ্বর জগত (বেহেশত) হতে নশ্বর জগতে নির্বাসন দেন এবং শয়তান ইবলীসের শত্রুতা বা মিথ্যা প্রতারণা হতে সাবধান থাকার পুণঃ পুণঃ উপদেশ ও আদেশ-নির্দেশে প্রদান করেন।

অতঃপর শুরু হয়ে যায় পার্থিব জগতের জীবনযাত্রা। পূণ্যকামী ও সত্যবাদী মানুষ সুন্দর ভাবেই জীবন যাত্রা শুরু করে। কিন্তু শয়তান তার মিথ্যা ও পাপের শোভা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে এবং মানব হৃদয়ের অধীনস্থ ও ঘুমন্ত (কুচিন্তা) পাপকে জাগ্রত করার আকর্ষণীয় ব্যবস্থা করে। এতে মাতৃভাষার সাহায্যে হৃদয়ের গভীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ সকল ভাষায় পারদর্শী পণ্ডিত ইবলীস অত্যন্ত মিথ্যাবাদী চতুর প্রতারক বিবেকহীও পথভ্রষ্ট হওয়ায় তার নিকট কোন কিছুই অসাধ্য থাকে না। একান্ত শক্তিশালী ঈমানদার ব্যতীত তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। এ বিষয়েও ইবলীস খুব দক্ষ। সে খুব ভালভাবেই চিনে ও জানে কার নিকট কেমন পাপের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া যাবে এবং কার নিকট তা নিয়ে যাওয়া যাবে না। তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান খুবই সুদূরপ্রসারী ও দূরদশী কিন্তু তা কৃত্রিম, অকৃত্রিম নয়। এই কৃত্রিমতাকে ধরার বা অনুভব করার মত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাদের থাকে; তারা পাপের হাত হতে আত্মরক্ষা করতে পারে বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে সে জ্ঞান নেই তারাই সাধারণত পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

বস্তুত: পক্ষে পূন্য ও পাপ এর সফল আলোচনা করতে গেলে, এ দু'টি শব্দের বা বিষয়ের প্রকৃত অর্থ জানা বা বোঝা আবশ্যক। শুধু পূণ্য ও পাপ নয় জীবন প্রবাহের যে কোন পর্যায়ের যে কোন শব্দ, বাক্য বা বিষয়ের সম্মুখীন হলে তার অর্থ বা মর্মার্থ বোধগম্যের মধ্যে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর সে বোধগম্যই হলো মাতৃভাষার গভীর জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভের জন্য বা উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

এক্ষণে পূণ্য ও পাপ এর আলোচনায় মানুষ অবশ্যই পূণ্য অর্থে ভাল কাজকে বুঝে থাকে এবং পাপ অর্থে যে কোন খারাপ কাজকে বুঝে নেয়। আসলে পূণ্য হলো আল্লাহর আদেশ ও আদেশের অনুকূলে যাবতীয় ভাল কাজ সমূহের সমষ্টি। পক্ষান্তরে পাপ হলো পূণ্যের বিপরীত অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের বিপরীত মন্দ কাজ সমূহের সমষ্টি। কিন্তু এই বোধ শক্তিতে উপনীত হতে বা বোধ শক্তি অর্জন করতে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য । কারণ মাতৃভাষার জ্ঞান ছাড়া কোন বিষয়ের পুরোপুরি স্বচ্ছতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিদেশী ভাষায় কোন পূণ্য বা ভাল কাজকে অথবা তৃতীয় পর্যায়ের কোন কাজকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করলে তা সীমাবদ্ধভাবে বোঝা সম্ভব হবে। একইভাবে কোন পাপ বা মন্দ কাজকে বিদেশী ভাষায় বোঝার চেষ্টা করলে পূণ্যের ন্যায় ফলাফল আসবে।

কিন্তু যখন কোন পূণ্যের পথে মাতৃভাষায় আত্মনিয়োগ করা যায়, তখন উহার অর্থ বা ভাবার্থ বোধগম্যের গভীরে চলে যায় এবং তাতে অসুবিধারও কিছু থাকে না বরং মঙ্গলের পথে এগিয়ে যায় এবং সেই চিন্তার ভাষা (মাতৃভাষা) পূণ্যেরই উৎসে পরিণত হয়। এসময় ছোট-বড় কোন পাপ চিন্তাই পূণ্যকামী ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন মন্দ পাপের পথে মাতৃভাষায়ই আত্মনিয়োগ করলেও মানুষ পাপের অতল তলে তলিয়ে যায় তখন পূণ্য পথের সব বিবেক বিবেচনাই হারিয়ে যায় তখন (সাময়িকভাবে) মাতৃভাষা পাপের উৎসে পরিণত হয়।

অবশ্য পূণ্য ও পাপের এই অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে মানুষ যেমন মাতৃভাষার সৎ উৎস হতে একদিকে পূন্যের পাহাড় গড়ে তোলে অতঃপর সেখানে শয়তানের আক্রমণে স্থির থাকতে পারে না তখন মাতৃভাষার বিপরীত ধারায় পাপের চরম নিম্নস্তরে চলে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে অদ্যাবধি চলে আসছে। আমাদের মহানবী (সাঃ)-কে প্রাচীনকালের বনী ইসরাঈলের জনৈক বিশিষ্ট আলেমের পথভ্রষ্টতার কাহিনী উদাহরণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশ দ্বারা অবহিত করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফের এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। উক্ত আলেম বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান, গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো। পবিত্র কুরআনে সে লোকের নাম

বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত মারদুক্তয়াহ (রহ) উদ্বৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বালআম ইবনে বাউরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেনআনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়াত আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রাদায়ের লোক ছিল। বালআম ইবনে বাউরা ইসমে আযম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হতো লোকেরা একথা জানত, তাকে বিশ্বাসও করত।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী হলো, ফেরআউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদিগকে জাব্বারীন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম হলো এবং জাব্বারীন সম্প্রদার যখন দেখল যে মুসা (আঃ) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন। পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় ফেরআউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল তখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বালআম ইবনে বাউরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মুসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুণ, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন।

বালআম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ। তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদ দোআ করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা তাও আমি জানি। আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকের পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বালআম বলল, আচ্ছা তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই এ ব্যাপারে দোআ করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মনুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে সপ্নযোগে তাকে বলে দেয়া হলো, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রাদায়কে বলল যে, বদ দোআ করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একট লোভনীয় উপঢোকরণ দান করল। প্রকৃত পক্ষে সেটি ছিল

উৎকোচ বিশেষ। সে যখন সেই উপঢোকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ উপরোধ আর পীড়পীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মুসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে আরম্ভ করল। সে মহূর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিষয় দেখা দেয় মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সে সবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল তুমি যে আমাদের জন্যই বদ দোয়া করছ। বালআম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, আমার জিহবা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়ালো এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নাযিল হলো। আর বাল আমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহবা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না।

ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জ্ঞাতার্থে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন "আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সে লোকের অবস্থা যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে পারতাম সে সকল নিদর্শন সমূহের দৌলতে। কিন্তু সে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মত, যদি তাকে তাড়া কর তবু হাঁপাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপালো। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শন সমূহকে অতএব আপনি বিবৃত করুণ এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে' (৭ আরাফ – ১৭৫, ১৭৬)।

উপরোক্ত আলোচনায় পথভ্রষ্ট মনীষী বাল আম ইবনে বাউরা সত্যি সত্যিই একজন সফল সাধক ও দরবেশ ব্যক্তি হিসেবে বিশেষ সম্মান ও পরিচিতি অর্জন করেছিল। এই অসামান্য উন্নতির অন্তরালে তার হৃদয়ের

ভাব, ভাষা ও ইচ্ছা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় ও আক্রমণে তার একই হৃদয়ের সাবেক (ভাল) ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং নতুনভাবে স্বার্থের প্রবৃত্তি জন্ম নেই। অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলে যায়। এতে কোন সন্দেহে নেই যে, মাতৃভাষার জ্ঞানেই সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছিল, আবার একই ভাষায় দগ্ধীভূত হয়ে অধঃপতনের অতলতলে তলিয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য এই সত্য ঘটনাটি শুধু উদাহরণ স্বরূপই বর্ণনা করা হলো, নইলে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোন অভাব নেই। কিন্তু সত্যায়নের সাক্ষ্য অভাবে বা অহেতুক আলোচনা হতে বিরত থাকার স্বার্থে সে দিকে না যাওয়াই উত্তম।

আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এরূপ সন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এখানে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ছোট ঘটনার সত্য দলীল (হাদিস) এর উদ্ধৃতি দেয়া হলো। হাদীসটি নবী পত্নী সাফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সাঃ) তখন রামাযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাঁর নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সাঃ) ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উম্মে সালমা (রাঃ) -এর দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন দু'জন আনছারী ছাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম করলেন। নবী (সাঃ) তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলা হলো হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবী (সাঃ) বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌঁছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হলো, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় না কি(বুখারী)।

বস্তুত পক্ষে পূণ্য সঞ্চয়ের পথে শয়তানের আক্রমন ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সাফল্য অনস্বীকার্য। উপরোক্ত উদাহরণে (কুরআনে বর্ণিত) প্রথমটিতে শয়তানের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। দ্বিতীয় (হাসীদের) আলোচনায় শয়তানের আক্রমণ হতে আগাম সাবধান থাকার হুশিয়ারী বাণী প্রতিধ্বণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় এরূপ পথভ্রষ্ট ও পথ প্রাপ্তদের বহু নযির রয়েছে। আবার কুরআন-হাদীসের বাইরেও ইতিহাস, উপন্যাসিক ও গল্পাকারে বহু পূণ্য ও পাপের খেলা সংঘটিত হয়ে আসছে সারা বিশ্বময়। আজ হতে মাত্র আড়াই শো বছর আগে

আমাদের এই অখণ্ড বাংলার বুকেই ঘটেছিল এক অমানবিক পাপাত্মার রক্তহীন ষড়যন্ত্র। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বালাম ইবনে বাউরার ন্যায় বাংলার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফরের নাম বাংলার ইতিহাসে কাল অধ্যায়ে চির ঘৃণাভরে লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর অভিশাপ ও ইচ্ছায় বালাম ইবনে বাউরার জিহবা কুকুরের মত তার মুখ হতে বের হয়ে লটকিয়ে গিয়েছিল, যা সকল মানুষের ঘৃণার উদ্রেক করে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলোচিত মীর জাফরের কবর এদেশের মানুষের কাছে বালআম ইবনে বাউবার চাইতেও ঘৃণ্য বস্তুর সমতুল্য। এমনকি কিছু মানুষ ঘৃণায় মীর জাফরের কবর লক্ষ্য করে জুতা ছুড়ে মারে।

আসলে পূণ্য ও পাপের চিন্তায় পবিত্র আল্লাহভীতির প্রয়োজন। আর আল্লাহভীতি উদ্ভাবনে আল্লাহর অস্তিত্বে ও পরকালে নিরঙ্কুশ বিশ্বাসী বা আত্মবিশ্বাসীর প্রয়োজন এবং শয়তানের ক্ষমতার প্রতি পুরোপুরি অবিশ্বাসীর প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে এবং অতীতেও যে কোন কর্ম পরিকল্পনায় পূণ্য ও পাপের সূত্র ধরে ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির কৃত্রিম ও অকৃত্রিম অনুসরণ করা হয়।

এর অনুকূলে ইসলামী স্বর্ণযুগের একটি স্মরণীয় ইতিহাস তুলে ধরা হলো, হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে রাজ্যের আভ্যন্তীর শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্ন থাকলেও নানা কারণে তিনি হাদীস প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। অনান্য ছাহাবী হাদীস খুব কমই বলতেন। কারণ তাঁরা হাদীস বলতে বিশেষ ভয় পেতেন। রাসূল (সঃ) স্বয়ং ঠিক যে রূপ বলেছেন, বা করেছেন, বা অন্যের কাজে ঠিক যেরূপ সম্মতি দান করেছেন, হাদীছ বলার কালে উহার কিঞ্চিৎ মাত্রও অন্যথা হয় এই ভয়ে হাদীস আবৃত্তিকালে ছাহাবীগণের শরীর রোমাঞ্চিত হতো। এমনকি কোন কোন সময় তাঁদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। হাদীছ বলতে কোন ব্যতিক্রম হলে মিথ্যা-সত্য বলে অহাদীছ হাদীছ বলে প্রচলিত হবে এবং তদ্রূপ মিথ্যা হাদীছ প্রচারের জন্য তাঁরা পরকাল হারাবেন, এই ভয় সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। কারণ হযরতের বর্ণনা অনুযায়ী মিথ্যা হাদীছ প্রচারকারী জাহান্নামী হবে।

আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে অনায়াসেই দেখতে পাব ও বুঝতে পারব আল্লাহর সৃষ্ট অসংখ্য বস্তুর মধ্যে অসামান্য বৈপরিত্য ও দূরত্ব বিদ্যামন, যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। আমাদের জানা মতে সেগুলো হচ্ছে সত্য-মিথ্যা, দিন-রাত্রি, আলো-অন্ধকার, তাপ-ঠাণ্ডা, আকাশ-

পাতাল ও স্বর্গ-নরক, সুন্দর-কুৎসিত, আনন্দ-দুঃখ, পবিত্র-অপবিত্র প্রভৃতি। আলোচ্য বস্তুগুলির সবই একটি অপরটির বিপরীত এবং একটি অপরটিকে অতিক্রম করতে পারে না বা গ্রাস করতেও পারে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পাশাপাশি রয়েছে অটল অবস্থানে আবহামান কালধরে। এই বস্তুগুলির ন্যায় আরও একটি আশ্চর্যতম বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরছি। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের ক্ষুদ্র নমুনা স্বরূপ ভূভাগের উপর বিশাল পানি রাশি সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে এর এক অংশের পানি মিঠা বা সুপেয় এবং অপর অংশের পানি লোনা বা তিক্ত। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযির পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে দেখা যায়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্য পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ– بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ–

'তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না' (আর রহমান ১৯, ২০)।

একই মর্মার্থে আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً–

'তিনিই সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিশ্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্ত রায় একটি দুর্ভেদ্য আড়াল' (ফুরক্বান ২৫/৫৩)।

পূণ্য ও পাপের উৎসের আলোচনায় উপরোক্ত ঐশীবাণীর দৃষ্টান্ত একেবারে যৌক্তিকতাহীন নয়। কারণ দুই সমুদ্রের পানির আলাদা বৈশিষ্ট্যের ফলে একটিকে অন্যটির সাথে মিশ্রিত হতে না দেয়ার কারণে আল্লাহর আদেশের বশবর্তী হয়েই উভয় সাগর তা লঙ্ঘন করে না। মানব জাতিকে

শিক্ষা বা উপদেশ দেয়ার জন্য পৃথিবীতে এসব অবিস্মরণীয় জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

বস্তুত উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নির্হিত কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়, গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত (দুই) এর প্রায় এক চতুর্থাংশ এ মহাসাগরের রাইরে উম্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এ সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট এবং সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণের এবং দৈনন্দিন ব্যাবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থল ভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মিশে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্টি হতো, তবে দ্রুত পচনশীল হওয়ায় মিষ্টি পানি দুচার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবনধারণ দুরূহ হয়ে যেত। তাই মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন, যেন বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী সে সকল সৃষ্ট জীব সেখানে মরে তাও পচে যায়।

এভাবে আল্লাহর মহাজ্ঞানের কুদরতে পৃথিবীর নদী ও নহর সমূহের মিঠা পানি সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা পানি একাকার হয়ে যায়। সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয় কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না। অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনাতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। উভয় দরিয়ার প্রতি আল্লাহর কড়া নির্দেশই তাদের পৃথক থাকার জন্য যথেষ্ট।

পূণ্য ও পাপের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রেও আমাদের দেহাভ্যন্তরে কোন অনতিক্রমনীয় অন্তরাল নেই, তবে অনেকেরই চরিত্র বৈশিষ্ট্যে যে সুদৃঢ় নৈতিক পবিত্রাবস্থা বিরাজ করছে তা বিশেষ ভাবে অবিশ্বাস্য। এদের পূণ্য প্রবাহের পাশাপাশি পাপ প্রবাহে পূণ্য প্রবাহের বিন্দু বিসর্গও ক্ষতি করতে পারে না। তবুও মানুষ হিসেবে কোন কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে,

সমুদ্রের সামান্য পানির দৃঢ়তা স্মরণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত আমাদের অজানা অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নিদর্শন রয়েছে যা একান্তই অনুসরণ যোগ্য।

এ মহাব্যাপক বিশ্বজগতের অগণিত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পূণ্য ও পাপ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও উল্লেখযোগ্য। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে অসংখ্য সৃষ্টিরাজির সকল বস্তুই তাদের স্রষ্টা মহাপরাক্রশালী মহাজ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। তবে এখানে মানুষকে একটা সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা প্রতিটি মানুষের নিজের জন্য যথেষ্ট। অথাৎ প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষা হতে উৎসারিত পূণ্য ও পাপকে নিজের ইচ্ছা মত প্রয়োগ করার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান করা হয়েছে। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজের ইচ্ছা মত পূণ্যও অর্জন করতে পারে আবার পাপও অর্জন করতে পারে। জীবনের এই সমান্য সময়টুকুতে আল্লাহতা'আলা তাকে এই সুবর্ণে সুযোগটুকু দিয়ে থাকেন।

আমরা মনে করছি, শুধু বর্তমান বিশ্বেই মানুষ কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দম্ভে, কেউ ধন সম্পদের দম্ভে, কেউ পাণ্ডিত্যের অহংকারে, কেউ সৌন্দর্যের অতিশয্যে, দম্ভোক্তি দ্বারা ধরার বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আসল কথা তা নয়। এটা মানব জাতির চিরাচরিত অভ্যাস বা সহজাত প্রবৃত্তিও বটে। যার ফলে অতি প্রাচীন কালে ফেরআউন, নমরুদ সাদ্দাদ, হামান, কারুন, আবু জেহেল, আবু লাহাব, এর দল সাময়িকভাবে মাথা উঁচু করে পৃথিবীর গৌরব অর্জনে করে মৃত্যুকালে কলঙ্কের ডালি নিয়ে বিদায় হয়েছে। তাদের ইতিহাস আমাদের জানা আছে এবং সেখানে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। পরবর্তীকালে আরও বহু জানা-অজানা ব্যক্তিত্ব পৃথিবী হতে পূণ্য ও পাপের বোঝা নিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। বিগত শতাব্দীগুলোতেও আলেকজান্ডার দি গেট্র, নেপেলিয়ান, বোনাপাট, মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক এ্যাডলফ হিটলার, চেঙ্গিস খাঁন, জুলিয়াস সিজার আব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ বড় বড় নেতারা বিশ্বকে হাতের মুঠেই রাখার জন্য যোগ্য মনে করতেন, তারা আজ কেউ পৃথিবীতে নেই।

মোটকথা পূণ্য ও পাপ সম্বন্ধে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সবারই একটা মৌলিক ধারণা রয়েছে। কোন কাজগুলি পূন্যের কাজ তা সবাই জানে বা বোঝে। পাপ ও পাপের কাজ সম্বন্ধেও মানুষের ধারণা কম নেই। তবে উহাদের তাৎক্ষণিক কোন ফলাফল নেই বলে মানুষ আলোচ্য বিষয়ে উদাসীন। সবার জন্য পূণ্য ও পাপের তাৎক্ষণিক ফলাফল না থাকলেও

অনেকের থাকে, যা প্রকাশযোগ্য নয়, প্রকাশ করা হয় না। বিবেকবান ও জ্ঞানী মহল নিরপেক্ষ বিচারে গবেষণা চালালে খুব সহজেই সেগুলোর সন্ধান পাবেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যে অস্থিরতা অঘোষিত যুদ্ধ, অজানা প্রতিশোধ, আত্মহনন, আত্মঘাতী আক্রমণ নির্যাতন, নিপীড়ন, অবিচার, ব্যভিচার, যূলুম, হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণ হুমকী প্রভৃতি বিরতিহীনভাবেই চলছে অহর্নিশি। এখানে অনেক পূন্যবান আল্লাহর রহমতে ও পূণ্যবলে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে অনেক পাপী তাপী সঙ্গে সঙ্গেই তার পাপের ফল ভোগ করছে। অবশ্য আল্লাহর বিধানমতই অনেক পূণ্যবানও এতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অনেক পাপী রক্ষা পাচ্ছে।

যেহেতু মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পূণ্য ও পাপের হিসাব নিবেন একই দিনে। সুতরাং এ পৃথিবীতে নিজের জীবদ্দশায় পূণ্য পাপের হিসাবের কোন দলীল নেই বরং কিয়ামতের দিনে সমস্ত বান্দার হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ তাদের ব্যক্তিগত আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই পূণ্য ও পাপের বিষয়টি সুদূর ভবিষ্যতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দুটির যাঁচাইকারী ও বিচারক হলেন স্বয়ং সর্বস্রষ্টা মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলা।

প্রকৃত পক্ষে পূন্য ও পাপের উৎস অন্তর, মন, ইচ্ছা ও হৃদয়ের ভাষা (মাতৃভাষা)। আর এগুলির স্রষ্টা ও মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কাজেই আল্লাহকে ফাঁকি দিয়ে পূণ্য ও পাপ কোনটাই সম্ভব নয়। পূণ্যের পরিকল্পনা ও উহার বাস্তবায়নে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু পাপের পরিকল্পনা ও উহার বাস্তবায়নে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কারণ পূণ্য ও পাপ সঞ্চয়ের মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দান করেছেন। অতঃপর সকলকে এই অবাধ সুযোগ গ্রহণ করে পূণ্য করার পূনঃপুনঃ আহবান জানিয়েছেন।

ইবাদতের সহায়তায় মাতৃভাষা

মহান আল্লাহ বলেন, –وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
"আমি জিন ও মানুষকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' (৫১ যারিয়াত ৫৬)।

এই ইবাদতের অর্থ ও সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। ইবাদতের মূল বাণীই হলো আল্লাহর একত্ব, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, সার্বভৌমত্ব, চিরঞ্জীব, মহিমাময়, সত্যময়, আলোকময়, সৎনির্দেশক, সর্বময় পালনকর্তা, মহাপরাক্রশালী মহাজ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য স্থাপন। অতঃপর তাঁর মনোনীত, নির্দেশিত ও পছন্দনীয় বিধানাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করার নামই ইবাদত। একই সঙ্গে আত্ম সংযম ও নফসকে বশীভূত করে মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ ঘোষিত কর্ম, তথা অপরাধ হতে ফিরে আসাও একটি অন্যতম ইবাদত।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী যে কোন ভাল কাজ করাও ইবাদত। আল্লাহর হুকুম মত পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, কৃষিকাজ, শিক্ষাব্যবস্থা, চিন্তা-চেতনা, লেনদেন প্রভৃতি সবকিছুই ইবাদত। ইসলামী জীবন বিধান জীবনের কোন একটি বিশেষ অংশ বা দিক নয় বরং তা জীবনের প্রতিটি দিক ও সমগ্র জীবনকে বুঝায়। তাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম সানন্দে ও সন্দেহাতীত চিত্তে প্রতিপালন করাই ইবাদত।

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ১. কালিমা, ২. ছালাত, ৩. ছিয়াম, ৪. যাকাত ও ৫. হজ্জ।

আমরা জানি ইসলামের মূল বিষয়গুলো আরবী ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ইসলামের পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু আরবী শব্দ ও বাক্য রয়েছে, যা ইবাদতের জন্য অপরিবর্তণীয় ভাবে ব্যবহার্য। অবশ্য অনেক বিষয় নিজ নিজ মাতৃভাষায়ও অনুশীলন যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম জীবন ব্যাবস্থায় যে কোন কাজ আরম্ভ করার সময়, বিশেষ করে খাওয়া দাওয়ার প্রারম্ভে পড়াশুনা শুরু করার মুহূর্তে, কোন হালাল প্রাণী জবেহ করার মুহূর্তে, কোন অনুষ্ঠানে বা সভাসমিতিতে বক্তব্য শুরু করার

প্রথমে এবং অনুরূপ যে কোন সৎ ও সুন্দর কার্য্যাবলী শুরু করার প্রথমে (আরবী বাক্য)-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি' বলা বাধ্যতামূলক। এখানে বিসমিল্লাহ বাদ রেখে উহার অর্থ পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি বলা শোভা পায় না বা বলা বৈধ নয়। অপরদিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ন শব্দ (বিষয়) = নিয়ত আরবী শব্দ। উহার বাংলা অর্থ উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সংকল্প প্রভৃতি। নিয়ত সম্পূর্ণ মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরের ব্যাপার এটা মুখে উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এটা হৃদয়েই বাস্তবায়িত হবে। উপরে বিসমিল্লাহ সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আসলে বিসমিল্লাহর সীমারেখা মোটেও সংক্ষিপ্ত নয়; বরং বহুল ব্যবহৃত সারা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ধর্মের (ইবাদতের) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মৌখিক উচ্চারণযোগ্য। একইভাবে নিয়তও বিসমিল্লাহর ন্যায় সমগ্র জীবনের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত, যাবতীয় পূণ্যের উৎস হিসেবে বাধ্যতামূলক ব্যাবহৃত একটি অবিচ্ছিন্ন বিষয়। কিন্তু মুখে উচ্চারযোগ্য নয়, শুধু হৃদয়ের সংকল্প মাত্র।

আমরা সংসার জীবনে সামাজিক জীবনে, পেশাগত জীবনে ভ্রমণকালে, দেশ- বিদেশ সফরে ও বিভিন্ন অঙ্গনে শুধু মাতৃভাষা ব্যবাহার করি না, যে ভাষা যার যতটুকু জানা আছে প্রয়োজনবোধে সে তা ব্যাবহার করে থাকে। কিন্তু ধর্মীয় জীবনে আরবীর প্রাধান্য শীর্ষস্থানে। তবে যে কোন দেশ বা দেশবাসী তার মাতৃভাষায় ধর্মীয় অনুশীলন করতে পারে বা করে থাকে। আমরাও আমাদেরও মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মীয় অনুশীলনীর বহুলাংশ আলোচনা করে থাকি। তবে ইবাদতের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক জায়গায় মাতৃভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ, সেখানে আরবী ভাষা ব্যাবহার বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলচনা করব।

ধর্মের প্রথম আদেশ বা প্রথম ধাপ ঈমান বা কালেমা তায়্যেবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা- ই লাহা ইল্লাল্লাহ), 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানব জীবনের বা ধর্মীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য। এ বাক্যের সঙ্গে পৃথিবীর কোন বাক্যের তুলনা হবে না।

ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গুরুত্ব অবর্ণনীয়। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় বাণীকে সর্বঊর্ধ্বে চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় রাখার জন্য পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ 'তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহাকরুনাময় দয়ালু কেউ নেই' (২ বাকারাহ ১৬৩)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী' (৩ ইমরান-২)।একই বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বাণী হচ্ছে, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ 'শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহর তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক' (২৩ মুমিনুর ১১৬)।

প্রকৃতপক্ষে ঈমানের মূল কথা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর একক উপাসনা ধর্মকে পৃথিবীর বুকে কায়েম করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সব শেষ নবী হলেন, আমাদের নবী হযরত মুহম্মাদ (সাঃ)। তিনি পৃথিবীর শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী এবং জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষও।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর একক রাজত্বে একক ধর্মকে দুনিয়ার বুকে সমুন্নত করার জন্য তাঁর মহাউন্নত ও পছন্দীয় কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব শেষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আদর্শ জ্ঞানভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার আদেশ-নির্দেশ দান করেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর নামের সঙ্গে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সংযুক্ত করেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌرَّسُوْ لُ اللّٰهِ

'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল' কালেমার প্রবর্তন করেন। এরপর মহাজ্ঞানী আল্লাহতা'আলা নবী করীম (সাঃ)-কে ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) কতৃক উপযুক্ত শিক্ষাদান

করেন, যা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। মোট কথা এক আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করা যেমন বাধ্যতামূলক, একই সঙ্গে তাঁর প্রিয় রাসুল (সাঃ)-এর অনুকরণ, অনুসরণ ও যাবতীয় আদর্শ মান্য করাও তদ্রূপ বাধ্যতামূলক।

বস্তত ঈমানের আলোচনায় উপরোক্ত দু'টি কালেমার আরবী উচ্চারণ

(১) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং (২) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র প্রতি আকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক উক্ত কলেমা দু'টির আরবী উচ্চারণ অনুশীলন করতে হবে, উহাদের অর্থনয়। অতঃপর এ কালেমা দু'টির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন, উহার বিস্তারিত কার্যক্রম মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা যাবে।

(২) ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলে নামাজ। সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নামাজের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশী। এমনকি সময়ের পরিমাণে জীবনের সমস্ত ইবাদতের সমষ্টির সমান বা তদপেক্ষা বেশীও হতে পারে। দিনে মাত্র পাঁচ বার নামাজ পড়া ফরয (আল্লাহর আদেশ)। অতিরিক্ত হিসেবে সুন্নত ও নফল নামাজও আছে। নামাজ হলো প্রকৃত ঈমানদার বান্দার অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত। এ ইবাদত হচ্ছে হৃদয়, অন্তর, জ্ঞান, মন, বিবেক, বিশ্বাস আত্মা ও নফস ইত্যাদিসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই ইবাদত। তবে এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তরের পবিত্রতা, আল্লাহ ভীতি ও নফসের অবস্থান ইত্যাদির প্রভাবই সবার্ধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলির অবস্থান ক্রটিমুক্ত হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাবহারও নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও ক্রটিমুক্ত হবে। নামাজের প্রস্তুতি পর্বের জ্ঞান অর্জন মাতৃভাষায়ই সম্ভব। এই প্রস্তুতি গ্রহণের প্রথমও শেষ কার্যক্রম সম্পাদন মাতৃভাষায়ই প্রস্তুত হয়। কাজেই শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

তবে নামাজের আসল অংশটুকুতে আরবী ভাষার গুরুত্ব শীর্ষ মহিমায় অধিষ্ঠিত। এই আসল অংশ হলো নামাজ শুরুর তাকবীরে তাহরীমা (اللّٰہ اکبر) 'আল্লাহ আকবার' হতে নামাজ শেষের সালাম اسَّلاَمُ عَلَيْـكَ وَرَحْمَتُلّٰه 'আসসালামু আমায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা। এর মধ্যে যে কুরআন পাঠ (সূরা), দুআ দরূদ সমস্তই আরবী ভাষায় উচ্চারিত বা পঠিত হয়। অর্থাৎ নামাজ আরম্ভের প্রথম প্রক্রিয়া বা কাজ প্রথমে কেবলামুখী হয়ে

দাঁড়িয়ে নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা (اللّٰہ اکبر) বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করে বুকে হাত বাঁধতে হবে। তারপর আরবীতে সানা অতঃপর পবিত্র কুরআন হতে সূরা ফাতিহা সহ আরও কিছু অংশ পাঠ করে তাকবীর বলে রুকুতে যেতে হবে। সেখানে কিছু আরবী দোআ পড়ে, অপর এক দোআর মাধ্যমে দাঁড়াতে হবে সিজদা হতে তাকবীর বলে উঠে বসতে হবে এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদায় গিয়ে দোআ পড়তে হবে। অতঃপর তাকবীর বলে সিজাদা হতে উঠে সোজা দাঁড়ালে এক রাকআত নামাজ সম্পন্ন হবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে শুধু সানা বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ, রুকু, রুকু হতে দাঁড়ান অতঃপর সিজদা, সিজাদা হতে উঠে পুরনরায় সিজদা সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া পূর্ব রাকআতের মতই পড়ে নামাজের ওয়াক্ত মোতাবেক রাকআত সম্পন্ন করে নামাজ শেষে প্রথমে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وبركاتـه 'আসমালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এবং পরে বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে 'আসমালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' পাঠ করলেই নামাজ শেষ হয়ে যাবে। নামাজ আদায়ের উপরোক্ত সময় মধ্যে মাতৃভাষায় দোআ পাঠের বা অন্য কিছুর সুযোগ নেই।

অবশ্য নামাজের মধ্যে অনেক আবেদনমূলক ক্ষমা প্রার্থনামূলক ও রহমতলাভের উপযোগী কুরআনের আয়াত ও হাদীসের দোআ সমূহ পাঠ করা হয় (আরবীতে)। এতদ্ব্যতীত নামাজের শেষ বৈঠকে আরও অধিক কল্যানমুখী দোআ পড়া যায় (আরবীতে)। এ সম্পর্কে একটি হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ) -এর পিছনে নামাজ পড়লে বলতাম আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ কথা শুনে নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক একথা বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই তো শান্তি ও শান্তিময় বরং বলবে (আত্তাহিয়াতু........)

"সমস্ত প্রশংসা, গুণগান, পবিত্রতা ও রহমত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাদের প্রতি'। কেননা তোমরা এ কথাগুলো বলে দোআ করলে তা আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে পৌঁছে যায়, সে আসমানে ও যমীনের মাঝে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। উপরোক্ত

কথাগুলো বলার পর বলবে, (আশাহাদু...) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"। 'অতঃপর যে কথা বলে দোআ করতে পছন্দ হয় তাই বলে দোআ করবে' (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীসের শেষোক্ত বাক্যের দোআও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত আরবী দোআ হতে হবে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং নামাজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সময়টুকুর জন্য আরবীতেই পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক । তবে নামাজের আগে ও পরে নামাজের গুরুত্ব ও উহার আধ্যাত্মিক আলোচনায় মাতৃভাষার অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। নামাজের মধ্যকার আবশ্যিক অংশের অনুবাদ একবার পড়লেই মানুষ ধর্মের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় বা যেতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফল কাম' (আল ইমরান -১০৪)।

অন্যত্র আল্লাহতা'আলা বলেন, "মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি সে তাঁর আগের পথ ধরে তাকে যে দুঃখদৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে যেন ডাকেইনি' (১০ ইউনুস-১২)। মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার' (৫৩ নাজম ৩১)।

বর্ণিত আয়াতের স্মরণীয় বাণীর সঙ্গে জ্ঞানী মানুষ নিবিড়ভাবে পরিচিত। এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আদেশ নিষেধে ও আশা-আকাংখায় মাতৃভাষার প্রতিধ্বনিই খুঁজে পাবে বার বার।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো রোজা। রোজা বাংলা শব্দ ইহার আরবী নাম সিয়াম বা সওম। সওম এর অর্থ বিরত থাকা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম, দমন, ইদ্রীয় সংযম, রোধ ইত্যাদি। রোজা পালনের উপযোগিতা হলো ফজরের নামাজের কিছুক্ষণ পূর্ব হতে সূর্য ডোবা পর্যন্ত সমস্ত দিন যে কোন খাদ্য বা পানীয় পান করা সহ সকাল প্রকার অশ্লীল কাজ ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। প্রতি হিজরী সনের রামাযান মাসের প্রথম তারিখ হতে শেষ তারিখ পর্যন্ত ২৯ বা ৩০ দিন সওম বা রোজা পালন করা হয়। এই ত্রিশ অথবা ঊনত্রিশ দিন একই নিয়মে পানাহার ও যৌন মিলন ছাড়াও অনান্য

বিষয়ে মিথ্যা কথা বলা, অকথ্যভাষা ব্যাবহার করা ঝগড়া-বিবাদ, গীবত-তোহমত, খুন-খারাবী, অন্যায়-অবিচার প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থেকে আত্মসংযম করতে হয়।

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) -এর সর্তকবাণী হলো রোজাদার অবস্থায় যে মিথ্যা কথা, মিথ্যা আমল, অকথ্যভাষা, গীবত ও অনান্য নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করল না আল্লাহর কাছে তার না খেয়ে থাকার দরকার নেই' (বুখারী)।

রোজা প্রধানত "ঈমান ও ছালাতে"র অনুশীলন দ্বারা পরিবেষ্টিত। রোজার জন্য একেবারে স্বতন্ত্র কোন ভাষায় চর্চা বা অনুশীলনী নেই। উহার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্মূর্ণরূপে মাতৃভাষা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় অবশ্য রোজা ইফতারের সময় আরবী ভাষায়, بِسْمِ اللهِ لرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ 'পরমকরুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি', অথবা অন্য দোআ, اللهُمَّ لَكَ ثُمْتُ وَعَلَرِسْكِكَ 'আপনার জন্য রোজা রাখলাম এবং আপনার রুজিতে ইফতার করলাম' (আবু দাউদ) আরবী ভাষায় পড়তে হয়।"

আলোচনার সারমর্মে দেখা যায়, পবিত্র ইবাদত রোজাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে মাতৃভাষার সুগভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

(৪) ইসলামের চর্তুথ স্তম্ভ যাকাত অনেকটা ভিন্ন ধরনের ইবাদত। কারণ যাকাত সার্বজনীন ইবাদত নয়, এটা শুধু ধনীদের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যাকাত হলো ধনী বা সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদের সামান্য অংশ মাত্র। এ সম্পদ টাকা-পয়সা, সোনা চাঁদি, খাদ্য ভাণ্ডার, পশুপালন ইত্যাদির যে কোনটি হতে পারে। নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ সম্পদ জমা হলে উহার মালিককে ইসলামের বিধান মতে ঐ সম্পদের কিয়দাংশ (৪০ ভাগের ১ ভাগ) বছর শেষে যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হয়। অতঃপর যাকাতের এই টাকা আল্লাহর নির্দেশ মতই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ধনীদের প্রতি এই আদেশ জারীর ফলে, আল্লাহর প্রিয় ধনী বান্দারা যাকাত প্রদান করে আর দরিদ্র বান্দারা তার উত্তরাধিকার হয়। বস্তুত ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি আল্লাহর ইচ্ছার ও মহাজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। শুধু মানবকে পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন, বিপুল ধন-সম্পদ দান করেন,

অতঃপর একইভাবে পরীক্ষার জন্য কাউকে দরিদ্র হতে দরিদ্রতর করে থাকেন।

যেহেতু ইসলাম হলো সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বিশ্বভাতৃত্বের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, অহিংসার ধর্ম, তাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে উত্তম ভাতৃত্ব বা উত্তম যোগাযোগের সেতুবন্ধন রূপে যাকাতের জন্ম হয়। এজন্য ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার যাকাত ছাড়াও বিভিন্ন পন্থায় দান-খয়রাত করারও বিধান ও দিক নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সর্বস্তরে। যাকাত ও দান খয়রাত এ নশ্বর জগতের ধনীও সম্পদশালী মানবের জন্য এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা। কারণ মহান আল্লাহতা'আলা একজন ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন দরিদ্র মানুষের দ্বারা ধনবান ও সম্পদশালীকে পরীক্ষা করেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ আর একজন খাদ্যভাণ্ডারে মালিকের নিকট হতে, খাদ্য প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হলে এদৃশ্যে আল্লাহতা'আলা অসন্তুষ্ট হন। একইভাবে কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি যদি কোন ধনকুবেরের নিকট একখানি বস্ত্র চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়, সেখানেও আল্লাহতা'আলা লজ্জিত হন। অনুরূপভাবে যে কোন দুঃখীজন সচ্ছল ব্যক্তির নিকট যাঞ্ছা করে ব্যর্থ হলে এখানেও আল্লাহর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। বিচার দিবসে এরা সরাসরি আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি স্থলে অবরুদ্ধ হবে।

যাকাত, দান-খয়রাত, সাদাকা প্রভৃতির উদার বিতরণ ব্যাবস্থা মানবতার স্বপক্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক মহোত্তম ব্যবস্থা। এই উন্নত মানবিক ব্যবস্থার ব্যাপক বৈশিষ্ট্য সমূহ হতেই জাতি-ধর্ম-নির্ধিশেষে মানুষ যুগে যুগে উল্লেখ যোগ্য পরিমাণ দান-খয়রাত ও উহার অনুকরনে পুরস্কার বৃত্তি প্রদান সহ নান ধরনের জনকল্যাণমুখী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন বিশ্বময়। অবশ্য যাকাত পৃথিবীর যে কোন দান ব্যাবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উন্নত ব্যাবস্থা। এর উন্নয়নে মাতৃভাষা অকৃত্রিম ও অভিন্নভাবে মিশে আছে।

(৫) ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হলো হজ্জ। এটা শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য একটি অন্যতম ইবাদত। হজ্জ সারাজীবনে একবার ফরয। তবে অধিক ধনাঢ্য বা সামর্থবান ব্যক্তিরা একাধিকবার হজ্জ করতে পারেন। পবিত্র হজ্জ পালনের কেন্দ্রভূমি মক্কার কা'বা ঘর বা বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) এজগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং আল্লাহপাকের সর্বাধিক প্রিয় স্থানরূপে ঘোষিত। মহিমাময় আল্লাহ এই প্রিয় ভূমিকে সমগ্র জগদ্বাসীর প্রিয় ভূমিতে পরিণত করাই এই মহান হজ্জ্বত ইবাদত পালনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈশিষ্ট্য।

প্রতি বছরের পবিত্র জুলহিজ্জাহ মাসে হজ্জব্রত পালনের জন্য বিশ্ব জগতের মুসলিম ভক্তবৃন্দকে মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ শরীফে সমবেত হতে হয়। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ বা বিধান মোতাবেক আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী (সাঃ)-এর ব্যবহারিক আদর্শের অনুগমন ও অনুসরণে হজ্জব্রত পালন করতে হয়। এখানে বেশ কিছু স্থানে আরবীর ব্যাবহার বাধ্যতামূলক।

পবিত্র হজ্জ পালনের নিয়তে বা উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছে, হজ্জ পালনের পূর্বেই উমরা পালন করতে হয়। আর উমরাহ পালনের জন্য ইহরাম (উমরাহ পালনের জন্য নির্ধারিত পোষাক) পরিহিত অবস্থায় নিয়ত করতে হয় ও বলতে হয় (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান) হে আল্লাহ। উমরার জন্য আপনার নিকট আমি হাজির। অতঃপর বায়তুল্লাহ বা কা'বাশরীফে যাত্রার পথে বা সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত নিম্নের দোআ (আরবীতে) সশব্দে পড়তে হবে' (উচ্চারণ–লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারিকালাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নেমাতালাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকালাকা। অর্থ আপনার নিকট আমি হাজির। হে আল্লাহ আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই সব রকম প্রশংসা ও সম্পদ-মালা আপনারই এবং বাদশাহী আপনারই, আপনার (কোন শরীক নেই' (তিরমিযী ১ম খণ্ড)।

অতঃপর মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে নিম্নের দোআ পড়তে হবে' (আল্লাহুম্মাফ তাহালি আবওয়াবা রহমাতিকা) 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন। তারপর উমরাহর নিয়ম অনুযায়ী আরও কিছু দোআ-দরূদ ও তাসবীহ পাঠের মধ্য দিয়ে উমরাহ পালন করা হয়।

পবিত্র উমরাহ পালনের পর, পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ৮ই যুলহিজ্জাহ তারিখে হজ্জের নিয়ত করে মক্কা হতে মীনা, আরাফাত ও মুযদালিফার দিকে রওনা হতে হয়। এজন্যে বাসায় ওযু-গোসল করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়াত করার সময় বলতে হয় (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান) অর্থ হে অল্লাহ! হজ্জের জন্যে আপনার নিকট আমি হাজির'।

অতঃপর পূর্বোক্ত দোআ, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা, লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা অন নিমতালাকা অলমুলকা লা শারীকা লাকা' পড়তে পড়তে মীনায় পৌছাতে হবে। হজ্জের বিধান অনুযায়ী

মীনা, আরাফাত ও মুযদালিফা মোট ৫ অথবা ৬ দিন অবস্থান করে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মক্কায় ফিরতে হয়।

এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানসূচীর অভ্যন্তরে এক ব্যাপক অর্থবহ মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। হজ্জব্রত পালনের এই সংক্ষিপ্ত সময় যে কোন অকল্যাণমুখী মানুষকে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অকল্যাণ হতে মুক্তি প্রদানে সক্ষম এবং যে কোন কল্যাণকামী মানুষকে তাঁর কল্পনাতীত মর্যাদার উচ্চশিখরে পৌঁছে দিতে সহায়ক। সুতরাং হজ্জব্রত পালনের সংক্ষিপ্ত সময় সমগ্র জীবনকে পরিচ্ছন্ন করার এক সুবর্ণ সুযোগ। এখানে সংক্ষিপ্ত ৫/৬ দিনে মীনা, আরাফাত, মুযদালিফা, অতঃপর তিন জামরায় পাথার নিক্ষেপ, কুরবাণী প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে হৃদয়গ্রাহী দোআ খায়ের হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ আরবী ভাষায় অনুষ্ঠিত হলেও মাতৃভাষায় অনেক দো'আ ও এর নিয়ম কানুন ও বিধান সমাপ্ত করতে হয়।

ইসলামের এ পাঁচটি মৌলিক বিষয় ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্মধ্যে সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা 'সালাম' প্রদান বা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলা আমাদের দিবারাত্রির জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। সালাম আরবী শব্দ এর অর্থ শান্তি, প্রশান্তি, কল্যাণ, দোআ, শুভেচ্ছা, রহমত প্রভৃতি। সালাম একটি সম্মানজনক, অভর্থনামূলক, অভিনন্দনমুলভ, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ইসলামী অভিবাদন। সালাম কোন পৃথক ইবাদত নয় ইবাদতের অংশও নয়, আবার ইবাদত হতে বিন্দুমাত্র বিছিন্নও নয়, বরং ইবাদতের পোষাক হিসাবে ব্যাবহৃত। এটা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র আদেশ। পোষাক যেমন বান্দার দেহের আবরণ সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং ইবাদতের জন্য অপরিহার্য, তদ্রুপ সালামও পরিবার সমাজ, মসজিদ, শিক্ষাঙ্গন, অফিস-আদালত, সভাসমিতি, রাস্তাঘাট, শহর বন্দর, খেলার মাঠ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত এক সম্মানীয় সহজ অভিবাদন। এ সম্মানীয় বাণীর নেপথ্যে যে স্বর্গীয় শান্তি দায়ক স্পর্শতা বিরাজমান তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু কুরআন ও হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে এর সূদূর প্রসারী মূল্যায়ন অনুসন্ধান করা যায় এবং এর রহস্য, তাৎপর্য, মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায়।'

সালাম মানব জীবনের কোন দেনা পাওনা নয়, কোন স্বার্থপরতার বিষয় নয়, কোন হিংসা বিদ্বেষের বিষয়ও নয়। ইহা একটি বরকতময় দোআ এবং আন্তরিক স্বচ্ছতা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। সালাম আদান প্রদানের ক্ষেত্রে

যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যামান। এজন্য আমরা সাধারণত দেখি সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকমণ্ডলীকে প্রায় নিয়মিত সালাম দেয়। এক বন্ধু অপর বন্ধুকে সালাম দেয়, কোন কোন পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতাকে, ছোটরা-বড়দেরকে সম্মান দেয়। নিম্মপদস্থরা উচ্চপদস্থদের সালাম দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরাই তাদের শিক্ষক ছাড়া অন্যদের বিশেষ করে অপরিচিতদের সালাম দেয় না, আবার সব ছেলেমেয়ে তাদের পিতামাতাকে সালাম দেয় না, বড়রাও সাধারণত ছোটদের সালাম দিতে অভ্যস্ত নয়, উচ্চ পদস্থরাও নিম্নপদস্থদের সালাম দিতে চায় না। এভাবে সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রধানত অজ্ঞতা, অবহেলা ও উহার যথাযথ অনুশীলনের অভাবই সালামের মধ্যে অনিয়ম সৃষ্টির প্রধান কারণ। মাতৃভাষায় এই নিয়ম অধ্যায়নের সাহায্যে ধর্মীয় এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান খুবই জরুরী।

একইভাবে এজগতের সব মানুষের ও সব ধর্মের এক ও অভিন্ন সমর্থন হলো সত্যবাদীতার পক্ষে। সত্য সব মানুষের আশীর্বাদ, পক্ষান্তরে মিথ্যা সব মানুষেরই অভিশাপ। এ বাস্তবতা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। সত্য এখন পুরোপুরি হুমকীর মুখে অর্থাৎ মিথ্যা তার অসাধারণ জ্ঞানের নিপুনতার দ্বারা সত্যের স্থান দখল করে নিতে চায় এবং কৃত্রিমভাবে করছেও অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু আসল সত্যের অবস্থান অসীম শক্তিশালী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মিথ্যা পরাজিতই থেকে যায় এবং সত্য অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও অত্যাচারী ফেরআউনের মিথ্যাদাবীর কথা বলা যায়। সে এক সময় নিজেকেই এ বিশ্বজগতের সর্বময় কর্তা বা অধিশ্বর বলে দাবী করেছিল। পবিত্র কুরআনে তার এ দাবীর বিষয়টি একাধিকবার প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ–

'ফেরআউন বলল, হে পরিষদবর্গ। আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানি না। হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও আর এক উচু প্রাসাদ বানাও যাতে আমি সেখান থেকে মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। তবে আমি তো মনে করি সে মিথ্যা বলছে' (ক্বাছাছ ২৮/৩৮)।

একই মর্মার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে, قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 'ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে আটকে রাখব' (শূ'আরা ২৬/২৯)।

ফেরআউনের বাড়াবাড়ির আরও একটি অদ্ভুত দৃশ্যপটের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসুল (সাঃ) -এর বরাবরে প্রত্যাদেশ করেন যে, "মুসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি? যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুবা উপত্যকায় আহ্বান করে বলেছিলেন, ফেরআউনের কাছে যাও নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে। অতঃপর বল তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। তারপর মুসা তাকে মহানির্দর্শন দেখাল। কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল, সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল এবং বলল, আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালে ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে' (৭৯– ১৫, ২৬)।

বিশ্বজগতের এহেন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী ও নিকৃষ্ট নাগরিক ফেরআউনের পরাজয়ের যে বাস্তব অবয়ব বিদ্যমান তাও পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা। হতভাগ্য ফেরআউন বা তার লোকেরা তার মৃত লাশটিরও হেফাজত করতে পারেনি। ফলে আজ (বর্তমান) তা মিশরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। আল্লাহর আদেশ পালন ও দর্শকদের কৌতুহল নিবারণের জন্য উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। তার লাশের বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলা আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, বানী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মাবুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ বলেন) এখন একথা বলছ। অথচ তুমি ইতিপূর্বে না ফারমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে, যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না' (১০ ইউনুফ –৯০-৯২)।

উপরোক্ত আলোচনায় ফেরআউনের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দিতা ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে। কিন্তু পরোক্ষ ও মহাসত্য বিষয়টি ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি। এখানে তার মিথ্যা দাবীকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং শুধু ফেরআউন ও তার বাহিনীকেই ধ্বংস করা হয়েছে। ফেরআউনের প্রতি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী কোন দেশ বা জনপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমাদের মহানবী (সাঃ)-এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এবং বর্তমান বিশ্বেও বহু বড় বড় শক্তিধর দেশের আবির্ভাব ঘটেছে। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, আসল-নকল প্রভৃতির দাবী নিয়ে মুসলিম-অমুসলিম, মুসলিম-মুসলিম এবং অমুসলিম-অমুসলিম প্রভৃতি শক্তিশালী শাসকবর্গের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে বা আজও হচ্ছে। কিন্তু এসব শক্তিধরেরা কেউ আল্লাহর মহাশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলেনি বা ফেরআউনের মত একমাত্র উপাস্য হওয়ার দাবীও করে নাই।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, আজ সমগ্র বিশ্বে একক শক্তি হতে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র হতে অপেক্ষাকৃত বড় বড় দল এবং আরও বৃহৎ বৃহৎ দেশ ও দল সত্য ও ন্যায়ের দাবী নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। বিশ্বের এই সংগ্রামী জনতার শতভাগই আজ সত্য ও ন্যায়ের দাবী নিয়ে নিজেদের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তৃনমূল পর্যায় হতে শুরু করে বিশ্বনেতৃবৃন্দ এসব দাবীর সত্যতা প্রমাণে হিমশিম খাচ্ছেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছেন, আবার অনেকে নীরব ভূমিকাপালন করছেন। কারণ বিরোধে লিপ্ত উভয় পক্ষের দাবী প্রায় এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ অভিযোগকারী বলছে তার দাবী সত্য। পক্ষান্তরে অভিযুক্তরা বলছে অভিযোগকারীর দাবী মিথ্যা তাদের দাবীই সত্য। এভাবে সত্যও মিথ্যা উভয়েই শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে দৃঢ়সংকল্প। বিশ্ব, দেশ, জাতি ও সমাজ সবাই এ বিষয়টি আজ পরিস্কার বুঝছে, ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির জটিলতায় অত্যন্ত কষ্টকর ভূমিকাপালন করতে হচ্ছে।

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা ব্যাবস্থায় প্রাথমিক স্তর হতে ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও অকৃত্রিম শিক্ষা ব্যাবস্থাপনাসমূহ বাধ্যতামুলক হওয়া উচিত। বিগত দশকগুলিতে সত্য, বাস্তব ও নৈতিক বিষয়গুলির মান ক্ষুণ্ন

হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটেছে। দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ মূল্যায়ন করে গবেষণা ধর্মী ও বাস্তবমুখী কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার মহাৎ উদ্যোগ সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

একই সঙ্গে ধর্মদ্রোহী বা নীতিবিরুদ্ধ কার্যাবলী যেমন মিথ্যা, অবিশ্বাস, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, দুর্ব্যবিহার, চুরি-ডাকাতি, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনখারাপি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী, অপরহরণ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার সীমালংঘন প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে সেগুলোকে প্রত্যাখান করাও অন্যতম আর্শীবাদ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং বাস্ত বজগতের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় বিষয়বস্তুসমূহের মধ্য হতে সঠিক সিদ্ধান্তগুলিই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

আসলে ইবাদত বলতে আমরা আরবী ভাষায় রচিত পুস্তকাবলী বা ঐ পুস্তকের অনুবাদ পুস্তককেই বুঝে থাকি। কিন্তু ধর্মীয় ভাবধারায় যাবতীয় অনুভূতিগুলি যে মাতৃভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাজেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইবাদতের উন্নয়নে মাতৃভাষার অবদান সন্দেহাতীত ভাবেই অনস্বীকার্য।

আল্লাহর বাণী ও মাতৃভাষা

এ বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কথা, মানুষের ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রজ্ঞা, শৌর্য-বীর্য প্রভৃতির ইতিকথায় আজ পৃথিবী ভরপুর। সমস্ত পৃথিবীতে এখন অসংখ্য জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞান বিতরণ ও প্রচারের জন্য অসংখ্য গ্রন্থমালা রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। পার্থিব জগতের একান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকের সংখ্যাও অনেক। বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে জীবন কাহিনীর সংখ্যাও আশানুরূপ। জীবনকাহিনী গুলোর মধ্যে নবী-রাসূল, মনীষী, গবেষক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের নাম ও তাঁদের আদর্শ বিশেষ শ্রদ্ধাভরে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁরা সবাই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিভূ ছিলেন। এবং অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহর প্রতিও বিশ্বাসী। তারাঁ বহু বাণী, উপদেশ বাণী ও আদেশবাণী রেখে গেছেন। তাঁরা কেউ নিজেকে মানুষের বা পৃথিবীর স্রষ্টা দাবী করেননি বা মানুষকে স্বর্গ-নরকে পৌঁছে দেওয়ার দাবীও করেননি। তাঁরা এক বা একাধিক কাব্য, মহাকাব্য ও অনান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি রচনা করে গেছেন। যারা দিগবিজয়ী তারা কিছু দিন পৃথিবীতে প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে কেউ সম্মানে, কেউ অসম্মানে পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় হয়ে গেছে। এরা পৃথিবীর বাদশাহী কামনা করলেও আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, দিবা-রাত্রির বাদশাহীর দাবী করেনি বা আল্লাহর সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি কোন অবমাননাকর উক্তিও করেনি। এ বিষয় আলোচনার প্রয়াসেই এই অধ্যায়ের সুচনা।

নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও দৃশ্য-অদৃশ্য মহাজগতের স্রষ্টা মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান সমুদ্রের কথা তাঁর একমাত্র প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে বোঝার জন্য ও ভালভাবে অবহিত করার জন্যে আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল -কুরআন অবতীর্ন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্যে তাঁর প্রেরিত কিতাবও এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর মহাজ্ঞানের সংরক্ষণের জন্য একমাত্র কুরআনকেই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় মহাগ্রন্থ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মহাজ্ঞানের ও মহামহিমার বিশেষ কোন অংশের বা জ্ঞানের জন্য বিকল্প কোন গ্রন্থের চিন্তা বা ব্যাবস্থা তিনি করেননি। তাঁর মহাজ্ঞানের তুলনায় পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত উপদেশমালা বিগত দেড় হাজার বছরের মানুষের এবং আগামী দিনের জগদ্বাসীর জন্য এক ও অভিন্ন উপদেশবাণী। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মহাগ্রন্থে নিজেকে নভোমণ্ড ভূমণ্ডল ও একদুভয়ের মধ্যবর্তী

যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা বলে ঘোষণা করেছেন। এতদ্ব্যতীব দৃশ্য ও অদৃশ্য জগত সহ অসংখ্য জানা ও অজানা বস্তুর স্রষ্টাও তিনি। তিনি ব্যতীত বিশ্বজগতে বা বিশ্বজগতের বাইরে একটি মশা, মাছি, পিপীলিকা অথবা ক্ষুদ্র ধুলিকণা, বালুকণা অথবা সামান্য আলোক রশ্মি, অগ্নিকণা বা পানিফোটারও কোন স্রষ্টা নেই।

তাঁর এই অসামান্য জ্ঞানের জগতকে উপলব্ধি করার জন্য মানব জাতিকে ভাষা বা মাতৃভাষার জ্ঞান দান করেছেন। সামান্য জ্ঞানী মানুষ তাঁর এই অসাধারণ (মাতৃভাষা) প্রাপ্তি হতে অনেক কিছু উদঘাটন করতে পারে। নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি অতঃপর মানব জাতির জন্য ভূপৃষ্ঠকে অসংখ্য বস্তু দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, বস্তু-সামগ্রীর সৃষ্টি কাহিনী পবিত্র কুরআনে ধারাবাহিকভাবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ–

‘আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়’ (১৬ নাহল –৪০)।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ– وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ– وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ–

‘আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর’ (যারিয়া ৫১/৪৭-৪৯)।

‘সৃষ্টি সংক্রান্ত এক শক্তিশালী ঘোষণায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমি তোমাদের উপর সপ্তপথ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই’ (মুমিনুন)।

একই মর্মার্থে অন্যত্র তিনি বলেন,

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً– وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً–

‘আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্তাআকাশ এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি’ (৭৮ নাবা– ১২, ১৩)।

সূরা আল-মুলকের ৩ আয়াতের অভিন্ন বাণী, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ‘তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন’ (৬৭ মুলক–৩)। বিষয়বস্তুর সাবলীলতা বৃদ্ধির প্রয়াসে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ‘আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি’ (মুলক ৬৭/৫)।

অপর এক আয়াতে করুণাময় আল্লাহ বলেন, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ‘নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি’ (আস-সাফফাত ৩৭/৬)।

একই ভাবার্থে সূরা রা‘দ এর ২ আয়াতে সর্বশক্তিমান ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর প্রত্যাদেশবাণী হলো, “আল্লাহ যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন। যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও’ (১৩ রাদ–২)।

ভূ-পৃষ্ঠে শোভা বর্ধন ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অসংখ্য উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্ভিদের আকৃতি-প্রকৃতি ও উৎপত্তির বর্ণনা দিয়ে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আমি মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য; তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী, যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপরও তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন’ (৩৬ ইয়াসীন ৩৩-৩৬)।

পবিত্র কুরআনে বিচিত্রধর্মী উদ্ভিদের সাক্ষ্যস্বরূপ আগত অহীর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ‘যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে, আর শস্য ও খেজুর রয়েছে একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্ট করে দেই।

এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে' (১৩ রাদ–৪)।

উপরোল্লেখিত আয়াত কয়টিতে বিশ্বজোড়া অগণনীয় উদ্ভিদ রাজির কতিপয় সাদৃস্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত উপদেশাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। যাহোক সারা বিশ্বব্যাপী সর্বব্যাপক বিচিত্র উদ্ভিদ সমূহের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতীত মহৎ। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহতা আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানুষ ও অনান্য অসংখ্য প্রাণীর বিপুল খাদ্যভাণ্ডার হিসাবেই উদ্ভিদের সৃষ্টি করেন। উদ্ভিদ হতেই উৎকৃষ্ট মানের খাদ্যদ্রব্য ফলজসম্পদ ও পানীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মানব প্রজনন সংক্রান্ত কুরআনের বিবরণ ও ব্যাখ্যার ভাষা সহজ-সরল, স্বাভাবিক ও বাস্তবমুখী। তাই সামান্য জ্ঞানী মানুষও অনায়াসে তা বুঝে নিতে সক্ষম। সৃষ্টির ইতিহাসে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِين 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?' (৭৭ মুরসালাত– ২০)।

সাদৃশ্য পূর্ণ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ– خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ– 'মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি থেকে' (আত-ত্বারেক– ৫, ৬)।

একই মর্মার্থে সূরা ইয়াসিনের ৭৭ আয়াতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী।' (৩৬ ইয়াসিন–৭৭)।

মানব সৃষ্টির অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান মাটির বর্ণনা দিয়ে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَال مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون– وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار السَّمُوم– 'আমি মানবকে পচাকর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং জিনকে এর আগে লু- এর আগুনের দ্বারা সৃষ্ট করেছি' (১৫ হিজর ২৬, ২৭)।

সৃষ্টি রহস্যের মূলবাণী উদঘাটন করে মহান আল্লাহ-তা'আলা বলেন, "হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি

এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও' (৪৯ হুজুরাত ১৩)।

অন্যত্র তিনি বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে' (ত্বীন–৪)।

পূর্ণাঙ্গ মানব সৃষ্টির বহু আয়াতের পরও কতিপয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর জন্য পৃথক পৃথক আয়াত রয়েছে। মানব জাতির সচেতনতা বৃদ্ধি ও অবহেলা রোধ করার প্রয়াসে এসব বৈচিত্রময় আয়াতের আগমন ঘটেছে। মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ– وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ– 'আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয় জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়' (৯০ বালাদ ৮ ও ৯)? অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে, "তিনি তোমাদের কান-চোখ ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন' (২৩ মমিনু – ৭৮)।

অতঃপর মানব জীবনের সমস্ত আশা-প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ 'আমি জীবনে দান করি, মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' (১৫ হিজর– ২৩)।

অন্যত্রও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ 'আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন' (৫০ ক্বাফ ৪৩)।

জন্মগতভাবে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মানী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সত্যবাদী, চিন্তাবিদ, সরল-সহজ, উদার, পরোপকারী, মহানুভব, সুশৃংঙ্খল, সুচতুর, সুবিজ্ঞ প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী। কিন্তু বিশেষ রহস্যহেতু মানুষের মাঝে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটায় উপরোক্ত গুণাবলীতে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বহুমানুষ মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যায়, অত্যাচার, ব্যভিচার, খুন খারাবি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মত অপরাধ প্রবণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলা এদের সুবিচার করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মানুষ জন্মগতভাবে সুখান্বেষণেরই প্রয়াসী। কেউ চায় ইহকালের সুখ, কেউ পরকালের সুখ, কেউ ইহকাল ও পরকাল উভয় অবস্থার জন্যই সুখী হতে চায়। এজন্য সাধারণত অধিকাংশ মানুষের নিজের ইচ্ছার অনুকূলে কাজ করার প্রবণতাই বেশী। মানুষের এই গতি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে। যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডল যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর! আল্লহ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে ও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্ররাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (সূরা লোকমান ২২–২৭)।'

মূলত : সমগ্র কুরআন বা উহার এক একটি বিষয়ের তাৎপর্য আকাশে সুসজ্জিত তারকাপুঞ্জের মতই সমুজ্জ্বল। নির্দিষ্ট সংখ্যক তারকা বা নক্ষত্র দ্বারা আকাশ মণ্ডলী সজ্জিত যদিও আমাদের দৃষ্টিতে তা অসংখ্য মনে হয়। আসলে আল্লাহর নিকট সবকিছুর পরিসংখ্যান রয়েছে। এক আয়াতে মহারহস্যবিদ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাঁর কাছে সব কিছুর পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন' (মারইয়াম ৯৪)'

পবিত্র কুরআনের বহুল আলোচিত আয়াতগুলির মধ্যে কিয়ামতের আলোচনা নিঃসন্দেহে শীর্ষ পর্যায়ভুক্ত। কিয়ামতের ঘোষণায় নয় বরং আলোচনায় বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মহাক্ষমতার অধীশ্বর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের 'আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কায় দেয়। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করবনা? পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলি পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষৎ জীবনে ও ধৃষ্টতা করতে চায়। সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে চন্দ্র

জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান' (৭৫ কিয়ামাহ১–১৪)।

অপর এক বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, 'কসম তুর পর্বতের এবং প্রশস্থ পত্রে, লিখিত কিতাবের কসম বায়তুল মামুর তথা আবাদ গৃহের এবং সমুন্নত ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের। আপনার পালানকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে এবং পবর্তমালা হবে চলমান। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছেমিছি কথা বানায়। যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে, এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে' (৫২ তুর ১-১৪)।

সাদৃশ্যযুক্ত অপর এক ঘোষণায় প্রত্যাদেশ হয়েছে, "যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতার কোন সংশয় নেই, এটা নীচু করে দেবে সমুন্নত করে দেবে। ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা এবং তোমরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকে কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে কত হতভাগা তারা। অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল অবদানের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণখচিত সিংহাসনে তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে' (৫৬ ওয়াকিয়াহ ১-১৬)।

কিয়ামত দিবসের এক বিশেষ দৃশ্যের বর্ণনায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে তাদের সঙ্গে কোমরভাঙ্গা আচরণ করা হবে। কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে কে ঝাড়বে এবং সে মনে করবে যে বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাজ পড়েনি, পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গেছে। তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। অতঃপর তোমার দুর্ভোদের উপর

দুর্ভোগ। মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সেকি স্থলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই আল্লাহ' মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (৭৫ কিয়ামাহ ২২-৪০)।

উপরের আলোচনায় পবিত্র কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াত বা আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য এই সব ঘোষণার সঙ্গে বা ঘোষিত বাক্যের অর্থের সঙ্গে মাতৃভাষার (বাংলার) মৌলিক বিষয়গুলি ও উহাদের ব্যাখ্যাগুলির সামঞ্জস্য কিরূপ মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর ঘোষণার ব্যাখ্যাগুলো সাধারণ না অসাধারণ? আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রধান প্রধান বা উল্লেখযোগ্য আদেশ-নিষেধ, ঘোষণা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা, বিধি-বিধান প্রভৃতি অসীম ক্ষমতার বিষয়গুলি পবিত্র কুরআনে বেশ সরল-সহজ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলিকে অধিক অর্থপূর্ণ বা ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ করতে বা তাঁর মহিমা, গরিমা, সম্মান, মর্যাদাকে আরও সম্প্রাসারিত করতে অনেক কিতাবের প্রবর্তন করেননি অথচ এটা তাঁর পক্ষে একান্তই সহজ। কিন্তু তিনি তা না করে এক গ্রন্থেই তাঁর মহাজ্ঞান পূর্ণ বাণী বর্ণনা করেছেন। মনে হয় এতে মানুষকে সংযতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা বা অনুরূপ কার্যাদিতে অবদান রাখতে ইংগিত করেছেন। এ ধারণা ভুলও হতে পারে তজ্জন্য অন্তর্যামী মহাজ্ঞানী আল্লাহর সমীপে শত কোটিবার ক্ষমাপ্রার্থী হচ্ছি। আল্লাহ যেন সেরূপ ধারণা হতে মুক্ত রাখেন। তবে পবিত্র কুরআনকে হৃদয়ের শীর্ষে রেখে ধর্মীয় লিখায় সংযম প্রদর্শন করাই উত্তম। শুধু ধর্মীয় পুস্তকেই নয় অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থেও ঐ সংযম বাঞ্চনীয়।

মানুষ সামাজিক জীব, একারণে তার অধিকাংশ মৌলিক চাহিদাগুলি প্রায় এক ও অভিন্ন এবং তার জন্মবৃত্তান্ত হতে শুরু করে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সময় সংসার জীবন পাড়ি দেয়ার বিচিত্র ইতিহাস গুলি পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু একটি দেশ বা তার পার্শ্ববর্তী দেশই নয় সমস্ত পৃথিবীর দূর-দূরান্ত হতে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত মানুষের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ, চাহিদা, ভোগবিলাস প্রভৃতিতে ব্যাপক সাদৃশ্য বিদ্যামান। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিবিড় অভ্যন্তরে যেমন আসাধারণ সাদৃশ্য বিরাজমান তদ্রুপ পৃথিবীতে প্রচলিত শত শত ভাষা বা মাতৃভাষার মধ্যেও অনুরূপ এক ও অভিন্ন সাদৃশ্য বিদ্যামান। সুতরাং আমাদের ধর্মীয়তাষা মাতৃভাষা না হলেও ঐ ভাষার সরল

সহজ বর্ণনা বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয় গুলোর বা কুরআনের বর্ণনা একান্তই সহজ এবং সকল ভাষার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইবাদতের পূর্ণতায় মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা

ইবাদত মানব জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন চিন্তা চেতনা। পৃথিবীর সকল মানুষ কেও প্রত্যক্ষভাবে, কেও পরোক্ষভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের অনেকে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। আবার অনেকে ইবাদতের বিকল্প হিসাবে অসংখ্য পথে ও পন্থায় প্রার্থনা করে। পৃথিবীর কোন জাতি বা দেশ ইবাদত বা প্রার্থনার বাইরে নয়, কিন্তু তা ভিন্নমুখী এবং বহুক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ, ত্রুটি মুক্ত নয়। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা এসব কিছুই জানেন, এজন্যে তিনি কাউরি প্রতি সন্তুষ্ট এবং কাউরি প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন, যা মানুষ মোটেও জানে না, জানার এই পদ্ধতির নামই ইবাদত।

মানব জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে অসংখ্য ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ, আনন্দ-বেদনা, অনুকূল-প্রতিকূল প্রভৃতি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যারা প্রকৃত সত্য ও সৎপথের অনুসারী তারা সঠিক পথের অনুসন্ধান করে। আর যারা অপেক্ষাকৃত দূর্বল (ভাল) তারাও সুন্দর পথেরই অনুসারী, কিন্তু তারা অনুসৃত বিষয়গুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে না। আর একটি বড় দল পৃথিবীর বুকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, জানা-অজানা প্রভৃতি বিষয়গুলো চলতি পরিবেশ পরিস্থিতি ও জাগতিক ভারসাম্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মোকাবিলা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সমন্বয়ে গঠিত আরও একটি বৃহৎ দল সম্পুর্ণরূপে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে থেকে, অনেকে সাধুবেশে, ছদ্মবেশে, অনেকে গোপনে, সংগোপনে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নানাবিধ কৌশলে সমগ্র পৃথিবীতে অন্যায় অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে বিরতিহীনভাবে।

মানবজাতির মধ্যে এই মতভিন্নতা শুধু একটি দেশের জন্য বা একটি জাতির জন্যে বা একটি সময়ের জন্যে নয়, সৃষ্টির শুরু হতেই এ বিষয়টি নিয়েই মানুষ দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী হওয়ায় মানুষ প্রায় সকল সমস্যার সমাধান করে সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

পৃথিবীর যে কোন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থকে তার মূল ভাষাতেই পড়া, লিখা ও অনুশীলন করা হয়। অতঃপর উহার মৌলিক বিষয়গুলো প্রচার মাধ্যমে মূল ভাষায় পাঠ করা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সে দেশের ভাষা বা মাতৃভাষা অনুযায়ী প্রচার করা হয়। যেমন আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমে প্রথমে কুরআন পাঠ করা হয়, তারপর এদেশের ভাষা বা মাতৃভাষা অনুযায়ী তার বাংলা অনুবাদ করা হয়। অন্যান্য ধর্মের মূল গ্রন্থ গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়, পরে তা এদেশের মাতৃ ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এ সমস্ত পড়া, লিখা বা প্রচারের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। কিন্তু এগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। যা একটি অপরটির বিরুদ্ধে আপত্তিকর। তারপরেও ইবাদতের শ্রেষ্ঠাংশের কিছু কিছু পদ্ধতি বা অনুশীলন সবার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং কিছু কিছু সাদৃশ্যমূলক। যেমন-আমাদের ইবাদত শ্রেষ্ঠ ছালাতের শ্রেষ্ঠাংশ সিজদা শুধু আমাদের জন্যেই শ্রেষ্ঠ নয়, বরং অনেক সভ্য জাতির ও ধর্মের নিকটও শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক। তাই গোপন ও আধ্যাত্মিক জগত ছাড়াও প্রকাশ্য খেলার মাঠেও বিভিন্ন ধর্মের খেলোয়াড়েরাও তাঁদের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মাঠের মাঝে, তাঁদের পরম প্রভূ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও জাতি তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধর্মীয় গুরু, বন্ধু-বান্ধব ও নেতাকর্মীদের মৃত্যুর স্মরণে একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রার্থনা করে, কোন কোন সময় দু'হাত তুলেও প্রার্থনা করে, আবার নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে মহান স্রষ্টার আল্লাহ তা'আলাকে পরম ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

উপরোক্ত আলোচনা ও সমালোচনার সমর্থনে, আমাদের (ইসলাম) ধর্মের শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক (ধর্মীয়) ভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ বহু আয়াতের আগমন ঘটেছে। যে বাণীগুলো মর্মার্থ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ বিষয়ে বিশ্বের মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ
مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ–

'মানুষ যখন কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন আমি তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়, কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনিভাবে মনঃপুত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে' (ইউনুস ১০/১২)।

প্রায় একই মর্মার্থে অন্যত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ– وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ
نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ–

'আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ কষ্টের পরে তাকে সুখ ভোগ করতে দেই,

তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দুর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়ে পড়ে' (হুদ ১১/৯, ১০)।

একই মর্মার্থে আরও প্রত্যাদেশ এসেছে, 'আর আমি মানুষকে তাদের দুঃখদৈন্য স্পর্শ করার পর অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তখনই আমার নিদর্শনকে উপহাস করে। বলো, উপহাসের শাস্তিদানে আল্লাহ আরও তৎপর। তোমরা যে উপহাস কর তা আমার ফেরেশতারা লিখে রাখে। তিনি তোমাদের জলে স্থলে যাতায়াত করান। আর তোমরা যখন নৌকায় ওঠ, আর (নৌকা) আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে খুশিতে চলতে থাকে, তারপর যখন তাদের উপর ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় এবং সবদিক থেকে ঢেউ আসতে থাকে এবং তাদের মনে হয় তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন তারা তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকে, 'আপনি থেকে আমাদেরকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের শামীল হব'। তারপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দৌরাত্ম্যে লিপ্ত হয়। হে মানুষ! তোমাদের দৌরাত্ম্য তো তোমাদের নিজেদের উপরই। পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, পরে আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো তোমরা যা করতে' (ইউনুস ১০/২১-২৩)।

মূলতঃ পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে। এখানে পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ নেই। এতে সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির দিক নির্দেশিকা বর্ণিত হয়েছে। আবার অকল্যাণ ও শাস্তির পথ হতে সুরক্ষার উপায় সমূহও বর্ণিত হয়েছে ঢালাওভাবে। আরও অসংখ্য জানা-অজানা, সাধারণ-অসাধারণ, সহজ-কঠিন, আশ্চর্য-অত্যাশ্চার্য ও মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য আয়াতের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিশাল কলেবরে। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ঈমানদারদের মর্মকথা এবং একই সঙ্গে পাশাপাশি বা পরিপুরকভাবে আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনকারীদের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকল বান্দাকেই (মানুষকেই) সম্বোধন করে বা আহ্বান জানিয়ে তাঁর মহাসত্য বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এ ধরনের সম্মানিত আয়াতগুলিতে সকল মানুষের বা অধিকাংশ মানুষেরই মনের কথা বা বাস্তবতার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ উপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল ধর্মাবলম্বী উপরোক্ত আয়াতগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এতদ্ব্যতীত মহান আল্লাহ্র আরও প্রত্যাদেশ বাণী হলো,

إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ–

'মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে, তারপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, 'আমি তো এ জ্ঞান দিয়ে লাভ করেছি। এ এক পরীক্ষা, কিন্তু এদের অনেকেই তা বোঝে না' (যুমার ৩৯/৪৯)।

একই মর্মার্থে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যেসব অনুগ্রহ ভোগ কর সে তো আল্লাহ্রই কাছ থেকে। আবার দুঃখদৈন্য যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই নম্র হয়ে ডাক। আবার আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখদৈন্য দুর করেন তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে, ওদের আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। তাই ভোগ করে নাও, শীঘ্রই জানতে পারবে' (নাহল ৫৩/৫৫)।

অপর এক বাণীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে ওদের প্রতিপালককে ডাকে, তারপর তিনি যখন ওদের উপর অনুগ্রহ করেন তখন ওদের একদল ওদের প্রতিপালকের শরীক করে থাকে, ওদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। ভোগ করে নাও তোমরা, শীঘ্রই (এর পরিণতি) জানতে পারবে' (রূম ৩৩/৩৪)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বাণীগুলি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে অবতর্ণি হয়েছে। এগুলি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়নি। সমস্ত মানুষের অন্তর্যামী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাদের (সব মানুষের) মনের চাহিদা, প্রবৃত্তি ও গতিবিধির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ বাণী সমূহ নাযিল করেছেন। এগুলি (উপরোক্ত আয়াতগুলি) অস্বীকার করার কোন অবকাশ কোন বুদ্ধিমান মানুষেরই নেই। কারণ আমরা খুব সহজে লক্ষ্য করেছি সমাজের অনেক নীচু স্ত রের বা নীচু জ্ঞানের এমন কি অর্দ্ধ পাগলেরাও কোন সমস্যায় পড়লে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চায় বলে মনে হয় ও দেখা যায় এবং একটা অধিকারে ভিত্তিতেই সে সাহায্য চায়। এ অধিকারের ভাষা হলো, বড়রাও আল্লাহ্র সৃষ্টি, আমরা ছোটরাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ সবার কথা সমানভাবে শোনেন এবং সবার সমান বিচার করেন বা করবেন।

মানুষের এইসব গণপ্রার্থনা বা আকাংখার অধিকাংশই অকৃত্রিমভাবে মাতৃভাষায় নিবেদিত হয়। ধর্মীয় ভাষায় অনুবাদ করে মনের চাহিদা বা বিপদ-আপদের নিরাপত্তা প্রার্থনা বা আকাংখা করা মানুষের সংখ্যা খুবই স্বল্পতম। ধর্মীয় আদেশ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম পালনের সময়গুলি ছাড়া অন্যান্য

যেকোন সময়ে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের মনের ভাষায় বা মাতৃভাষায় আবেদন নিবেদন, ক্ষমা, দয়া, রহমত ইত্যাদি প্রার্থনা বা আশা আকাংখা করা যাবে এবং তাতে কোন অসুবিধা হবে না। এখানে প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতার ও পবিত্রতার। এ প্রার্থনায় বা মানসিক আরাধনায় কোন বাধা নেই, বরং সমান ও সামান্তরালভাবেই গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট সব ভাষায় এক এবং তিনি মানব জাতির ব্যবহৃত হাজার হাজার ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি ভালভাবেই জানেন পৃথিবীর কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী মানুষই সকল ভাষায় পণ্ডিত নন। শুধু মাতৃভাষায় অগাধ পণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হতে পারেন। এ মহাজ্ঞানের বিকাশ স্বরূপই তিনি এ পৃথিবীতে ধর্ম প্রচারের জন্যে প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তাঁর স্ব স্ব মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করে ঐ ভাষায় কিতাব দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ–

'আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষি করেই প্রেরণ করেছি যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়' (ইবরাহীম ৪)।

উপরোল্লেখিত আয়াতটি দ্বারা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জ্ঞান লাভের জন্য ও জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য তাদের মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, প্রাধান্য দিয়েছে। সুযোগ দিয়েছেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আবহমানকাল ধরে।

পরিশেষে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা ও আদর্শের একমাত্র ভিত্তি ধর্ম ও ধর্মীয় ভাষাও মাতৃভাষা হওয়া উচিত। এই অকৃত্রিম সত্য দাবীর উদ্ভাবক বিশ্বস্রষ্টা মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। কাজেই মাতৃভাষা নিয়ে বা তার দাবী নিয়ে চিরস্মরণীয় সংগ্রাম আমাদের ধর্মীয় উন্নয়নেরও অবিচ্ছেদ্য অংগ। সুতরাং মাতৃভাষা শুধু আমাদের জাতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতি, শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদদের ঐতিহাসিক সম্মাননা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারণেই নয়; বরং মানুষের শেষ পরিণতির রক্ষাকবচ 'ধর্ম' এবং ধর্মীয় স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, গভীরতা, মহত্ব, মহানুভবতা, মানবতা প্রভৃতি কারণে মাতৃভাষার অবদান অনস্বীকার্য।

হৃদয়ের ভাষাও মাতৃভাষা

ভাষা আল্লাহর দান। ভাষা মানুষের সহজাত জন্ম অধিকার। পৃথিবীতে অসংখ্য আকৃতি প্রকৃতি, সৌন্দর্য- অসৌন্দর্য, অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বাকরুদ্ধ প্রভৃতি রকমের মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এদের প্রত্যেককেই আল্লাহ দু'ভাবে প্রকাশ করার ভাষাজ্ঞান দান করেছেন তা হলো (১) মুখের ভাষা ও (২) মনের ভাষা।। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই মুখের ভাষা ও মনের ভাষা উভয় ভাষারই অধিকারী। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোককে মুখের ভাষা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তারা বোবা-বাকরুদ্ধ। আল্লাহ তাদেরকে শুধু মনের ভাষা দান করেছেন। তবে উভয় প্রকার ভাষায় জ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষ এই ভাষাহারা বোবাদের (লোকদের) অনেক ইশারা-ইংগিত বোঝে এবং এর সাহায্যে তাদের অনেক কাজ হয়। তাদের উচ্ছ্বসিত আবেগ ও হাহাকার ধ্বনি বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষকে ব্যথিত করে তোলে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর এই বিধান সম্পুর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর যে কোন দেশ, যে কোন জাতি বা রাষ্ট্র আল্লাহর এই নির্ধারিত বিধান হতে মুক্ত নয়। পৃথিবীর সকল জ্ঞানী-বিজ্ঞানী একমাত্র তাঁর মাতৃভাষার আলোকেই আল্লাহর এই অসীম রহস্যময় জ্ঞানের তাৎপর্য অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কোন বোবা বা বাকরুদ্ধ মনে হয় তার হৃদয়ের ভাষা দ্বারা এই প্রতিকূল বা অনুকূল কোন চিত্রই দেখতে পায় না বা বোঝে না, নিজে বোঝে আর অন্যকে কি বোঝাতে চায়, একমাত্র তার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। তবে মানবতাকে স্পর্শ করার এই করুণ বাস্তবতা হৃদয়ের ভাব ভাষাকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করার এক অনন্য নিদর্শন নিঃসন্দেহে।

মুখের প্রকাশ্য ভাষার দ্বারা যেমন যে কোন কথা বলা যায় না, বরং চিন্তা করে কথা বলতে হয় বা বলা উচিত। এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায় এবং মানুষের কাছেও শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র হওয়া যায়। পক্ষান্তরে মুখের ভাষা অসংযত হলে অর্থাৎ যা খুশী তাই বললে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষও তা পছন্দ করে না, অনেকে ঘৃণা করে। অনুরূপভাবে অন্তরের ভাষা দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে সেখানেও ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করে ধৈর্যের সঙ্গে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলে অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং জ্ঞান সম্পন্ন বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও ও অনুধাবন করে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করবে। অন্যথা অন্তরের চিন্তা বা ভাষা দ্বারা অসৎ চিন্তা বা পরিকল্পনা তৈরি করলে তা সীমালংঘনের দিকে চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় আল্লাহর অসন্তোষ হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অন্তরের বা হৃদয়ের ভাষাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ বিষয়ে সর্বজ্ঞ আল্লাহ বলেন, "যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু

যমীনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান" (২ বাকারাহ ২৮৪)।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত" (৬৪ তাগাবুন-৪)।

ঈষৎ পরিবর্তিত অর্থে প্রত্যাদেশ এসেছে, "আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে, আজ যুলুম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। চোখের চুরি ও অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন" (৪০ মুমিন ১৭-১৯)।

অতঃপর এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী হলো, "যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না" (৪৭ মুহাম্মাদ ২৯)? সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাদেশ করেন, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ" (৩৯ যুমার ২২)।

আমরা এ পার্থিব জগতের অধিবাসীরা প্রধানত মুখের ভাষা বা কথা নিয়েই আলোচনা করি বা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সমাধা করি। হৃদয়ের কথা বা ভাষা নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোন আলোচনা বা সমালোচনা করা হয় না। কারণ যারা পারস্পরিক আত্মীয়তা নিয়ে চলে, তারা তো নিজেদেরকে আন্তরিকভাবেই আপনজন মনে করে। আর যারা বন্ধুত্বের বা বিশ্বস্ততার গভীর দাবী নিয়ে চলে, তারাও নিজেদেরকে একান্ত আন্তরিক ভেবেই চলাচল করে। আবার যারা দলীয়ভাবে এসে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারাও তাদেরকে একে অপরের সঙ্গে দুনিয়ার স্বার্থে অকৃত্রিম বিশ্বাসী বলেই মনে করে, মোটামুটি এটাই দুনিয়ায় চিত্র।

কিন্তু আসল কথা তো তা নয়, ইতিহাস তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, দল- বল প্রভৃতি প্রায় সবার মধ্যে মুখের প্রকাশ্য কথা বা ভাষা ও মনের গোপন কথা বা ভাষায় গরমিল দেখা যায়। অবশ্য এই গরমিলের মধ্য দিয়েই জীবনের অধিকাংশ সমস্যা সমাধান করা হয়। আবার বহু গোলযোগও হয়। এমনকি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সহিংস ঘটনাও ঘটে থাকে মাঝে মাঝে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত কুচিন্তা ও শয়তানের প্ররোচনা হতে মানুষকে সন্দেহমুক্ত হয়ে, মুখের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষায় দ্বিমত ও সহিংসতা পোষণ করা হতে বিরত থাকার

প্রয়াসেই আল্লাহতা'আলা উপারোক্ত আয়াতগুলি ও অনুরূপ আরও বহু উল্লে-খযোগ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

মানুষের মুখের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষা এক ও অভিন্ন হলে এ জগতে দেশে-বিদেশে এত সমস্যা সৃষ্টি হত না, এত অশান্তি হত না, মিথ্যা দুর্নীতি, প্রতরাণা এত মাথা চাড়া দিতে পারত না। কিন্তু এ বিষয়টি সমাজে একান্ত অবহেলিত, অনালোচনীয় ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হৃদয়ের বা অন্তরের ভাষা সম্পূর্ণ অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য বস্তু। এ বিষয়ের উপর নীতিগত কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করার ন্যয় সঙ্গত উপায় নেই। একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলায় উহার একক মালিক। কেউ মনের আসল কথা গোপন রেখে নকল কথাকেই আসল বলে দাবী করলে, তার নকল বা মিথ্যা কথাকেই আসল বা সত্য বলে মেনে নিয়ে কাজ করা হয়। অবশ্য দোষী বা অপরাধীদের ক্ষেত্রে ঐ দাবীর মূল্যায়ন করা হয় না। আর যাদেরকে দোষী বা অপরাধী বলে সন্দেহ করা হয় তাদেরকেও বিশেষ প্রমাণাদির দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। তারপরও এসব ঘটনায় পুরোপুরি স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বা অসম্ভবও হয়ে পড়ে অন্ধকার হৃদয়ের ভাষার প্রতিযোগিতায়।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহতা'আলা মানুষকে মুখে কথা বলার ও যাবতীয় কাজকর্ম করার বা বোঝার জন্য মাতৃভাষার জ্ঞানদান করেছেন। অতঃপর এই ভাষাজ্ঞানকে সর্বাঙ্গণ সুন্দর ও সবার জন্য আকর্ষণীয় করার মহোত্তম উদ্দেশ্যে হৃদয়ের ভাষাকেও মাতৃভাষা করেছেন। তিনি হৃদয়ের ভাষাকে, অজ্ঞাত হৃদয়ের মত অন্য কোন অজ্ঞাত ভাষায় রূপদান করলে মাতৃভাষায় পাণ্ডিত্যলাভের সরল-সহজ পথ রুদ্ধ হয়ে যেত। মুখের অপেক্ষা হৃদয়ের ভাষার গভীরতা অপরিসীম। এই অসামান্য অবদানের নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা, এ জ্ঞান দানের অন্যতম প্রধান কারণ।

মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও পরিচালক। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এ সবের বাইরে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভূক্ত। শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্যই এসব বিপুল আয়োজন। এদের জন্য একটা নিয়ম প্রণালী একটা বিধিব্যাবস্থা রয়েছে। যারা উক্ত বিধিবিধান ও নিয়ম-প্রণালী অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির ব্যাবস্থা। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদের জন্য মহাশাস্তির ওয়াদা রয়েছে।

আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা, হৃদয়ের ভাষাও মাতৃভাষার সাদৃশ্যপূর্ণ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দৃষ্টিসীমা ও জ্ঞানসীমার মধ্যে রয়েছে। মুখের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষা এক না হলে এ দু'টিকে এক অবস্থানে নিয়ন্ত্রণে রেখে জীবনযাপন করার জন্য (মানব জাতির প্রতি) আল্লাহ কঠোর আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর এ বিষয়ের সাদৃশ্যযুক্ত অনান্য সৃষ্ট বস্তুর নিদর্শন দেখারও

আহবান জানিয়েছেন। যেমন আসমান-যমীন, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-মহাসাগর, দিবা- রাত্রি, আলো-অন্ধকার প্রভৃতি এক ও অভিন্ন কল্যাণময় বৃহৎ বৃহৎ বস্তুগুলি আল্লাহর আদেশে পৃথক অবস্থানে থাকলেও তাদের কার্যক্রম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এতদসঙ্গে আল্লাহর আদেশের সম্পূর্ণ অনুবর্তী।

উদাহরণত, এদের মধ্যে অত্যাশ্চর্য বাস্তবতা হলো, সাগর-মহাসাগরগুলোর প্রবাহ বা আন্তস্রোতগুলিকেও আল্লাহপাক সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রেখেছেন। তাছাড়াও এগুলোর পানির স্বাদের মধ্যে অভাবনীয় পার্থক্য বিরাজমান। পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি দরিয়া বা সমুদ্রের অভিন্নপানির স্বাদ দু'প্রকার মিঠা ও লবণাক্ত। এ বিষয়ে আল্লাহর মহাজ্ঞানের বাণী, 'তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল' (২৫ ফুরকান ৫৩)।

উপরোক্ত আলোচনার বাস্তবতা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশাপাশি প্রবাহিত বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় বা বাধা প্রাচীর থাকায় উভয়পার্শ্বের পানির স্বাদ বিপরীতধর্মী। সমুদ্রের মধ্যে এই অন্তরায় বা বাধা প্রাচীর কোন দৃশ্যমান বস্তু নয়, নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বস্তু; আল্লাহর আদেশ। আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ দুটি দরিয়া বা সমুদ্র পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন। এই দুই সমুদ্রের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। এ অন্তরালই আল্লাহর আদেশ যা অদৃশ্য অলৌকিত ও অসামান্য শক্তি। সমুদ্রের পানির প্রতি আল্লাহর কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকায় দুটি সমুদ্রের পানি পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েও উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না। একটা জড়বস্তু ও আল্লাহর আদেশের এদিক ওদিক করতে পারে না।

মানুষের মুখের ভাষা ও হৃদয়ের ভাষা দৃশ্যত আলাদা মনে হলেও প্রকৃত অর্থে আলাদা নয়। আল্লাহর আদেশ পালনের মহান লক্ষ্যে এ দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করাই প্রকৃত মানবিক কর্তব্য। অবশ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষের মুখের ভাষাও হৃদয়ের ভাষা উভয় মাতৃভাষাকে এক ও অভিন্ন করতে পারতেন । এটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ। কিন্তু তাঁর নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই তিনি এ সামান্য ক্ষমতাটুকু তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শনের জন্য বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কুরআন দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই পথে চলার তওফীক দান করুন।

উপসংহার

দেখা যায় ধর্মীয় জ্ঞান সঞ্চয়ের অন্যতম উৎস হিসাবে মাতৃভাষার স্থান শীর্ষে। আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় ভাষা বলতে আরবী ভাষাকেই বুঝে থাকি। কারণ ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আরবী ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে রয়েছে ইসলাম ধর্মের অবশ্যকরণীয় (ফরজ) পাঁচটি আদেশ– (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) সিয়াম (৪) হজ্জ ও (৫) যাকাত। অতঃপর এগুলির সম্মান-মর্যাদা, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য, সৌন্দর্য, পরিবেশ, গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতির আবশ্যকতায় আরও অসংখ্য বিধিবিধান, নিয়ম-কানুন, আইন-কানুন পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রভৃতির প্রবর্তন ও প্রচলন একান্ত বাধ্যতামূলক। যেমন সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা না বলা, ভাল কথা বলা, মন্দ কথা না বলা, নম্র ব্যাবহার করা, কর্কশ বা ঔদ্ধতপূর্ণ ব্যাবহার না করা, পরস্পরের মধ্যে মিলেমিশে থাকা, ঝগড়া-বিবাদ না করা, ন্যায় বিচার করা, অবিচার না করা, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁকে অবিশ্বাস না করা, কিয়ামত, পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করা, এগুলি অবিশ্বাস না করা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের আদেশ-নিষেধ নিয়ে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।

এদিকে পৃথিবীতে মানব চরিত্র গঠনের জন্য বড় বড় পণ্ডিত ও লেখকগণ তাঁদের নিজেদের মাতৃভাষায় বহু বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এসব বই-পুস্তকের শিক্ষাণীয় অনেক বাণী পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ সত্য কথা বলা ও মিথ্যা না বলা, ন্যায় সঙ্গত কথা বলা ও কাজ করা, অন্যায় কথা না বলা ও অন্যায় কাজ না করা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদি না করা সহ আরও অনেক শিক্ষণীয় নীতিবাক্য পবিত্র কুরআনের আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষকে সুশিক্ষা দেয়ার উপদেশ ভাণ্ডার সম্বলিত পবিত্র মহাগ্রন্থ মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর প্রেরিত বাণী। আর মানুষকে নৈতিক চরিত্র শিক্ষাদানের পুস্তক, চরিত্র গঠন মানব রচিত পরামর্শমূলক আদর্শগ্রন্থ। অথচ উভয় গ্রন্থের অভ্যন্তরস্থ বহু বাণী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় একই। এর নেপথ্যে মহারহস্যবিদ আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও অলৌকিত রহমত রয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ প্রেরিত মহাগ্রন্থ (বর্তমান) শুধু একখানাই, তাহলো কুরআন এবং উহার ভাষা আরবী। পক্ষান্তরে মানব রচিত সত্যগ্রন্থ, চরিত্র গঠন, আদর্শ চরিত্র, আদর্শ মানুষ, মনীষী চরিত, সত্য পথের সন্ধানে প্রভৃতি বহু পুস্তক পৃথক পৃথক ভাষায় পৃথক পৃথক পণ্ডিত বা লেখকগণের দ্বারা রচিত। কিন্তু বর্ণিত বিষয়বস্তু সমূহের মর্মার্থ,

ভাবার্থ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি অধিকাংশই গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোন কোনটি এক ও অবিভাজ্য। তাহলে দেখা যায় পৃথক পৃথক ভাষায় রচিত হয়েও কোন কোন শব্দ বাক্য বা বিষয়ের অর্থ পৃথক হয় না, বরং একই থাকে। অতঃপর সেগুলিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যত সহজ হয় এবং গভীর হতে গভীরতম হয়, অন্যভাষায় তা হয় না, কোন কোন ভাষায় তা খুব কঠিনই হয়। এ সমস্যার বিষয়টি আমরা সবাই কমবেশী বুঝে থাকি।

সুতরাং ধর্মীয় ভাষা আরবীতে রচিত কুরআন-হাদীস প্রভৃতি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ করে তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বা গবেষণা করলে কোন অসুবিধা নেই সুবিধাই রয়েছে। যেহেতু আরবী সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জন্য একটি কঠিন ভাষা এবং উহার অর্থ, ভাবার্থ ইত্যাদি আরও কঠিন। কিন্তু উহার মাতৃভাষায় অনুবাদ এবং উহার জটিল ভাবধারা আমাদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে ধর্মীয় ভাষা ও জ্ঞানকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে ধর্মপালন বিষয়ক শিক্ষার আশাতীত অগ্রগতি হয়েছে এবং ধর্মীয় ভাষা আরবীকে কঠিন মনে করে যারা দূরে সরে থাকে এবং প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে অত্যন্ত ভালবাসে তারা ধর্মীয় অনুবাদ গুলো অধ্যয়ন করলে ধীরে ধীরে কোন বৈষম্য বা পার্থক্যই দেখতে পাবে না। আমরা আশা করি এবং দোআ করি অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেশবাসীর ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন লোকদের মনে মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য মাহাত্ম্য বোঝার তওফীক দান করুন। আমীন!!

***

লেখকের প্রকাশিত বই সমূহ

১। সৃষ্টির সন্ধানে।
২। আমলনামা।
৩। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ।
৪। ইসলামধর্ম ও মাতৃভাষা।
৫। আল্লাহ ক্ষমাশীল।
৬। শ্রেষ্ঠ ইবাদাত ছালাত বা দো'আ।